সূর্য-দীঘল বাড়ী

আবু ইসহাক

চিরায়ত প্রকাশন
প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট • কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ : ১৯৫৫, ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশক

শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর

সমরেন্দ্র মণ্ডল
দি নিউ মণ্ডল প্রিণ্টার্স
৪/১-ই বিডন রো, কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ : সন্দীপন ভট্টাচার্য

সূর্য
দীঘল
বাড়ী

বাবার স্মৃতির উদ্দেশে

আবার তারা গ্রামে ফিরে আসে। পেছনে রেখে আসে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, মা-বাপ, ভাই-বোন। ভাতের লড়াইয়ে তারা হেরে গেল।

অনেক আশা, অনেক ভরসা নিয়ে গ্রাম ছেড়ে তারা শহরের বুকে পা বাড়িয়েছিল। সেখানে মজুতদারের গুদামে চালের প্রাচুর্য, হোটেলে খাবারের সমারোহ দেখে দেখে তাদের জিভ শুকিয়ে যায়। ভিরমি খেয়ে গড়াগড়ি যায় নর্দমায়। এক মুঠো ভাতের জন্যে বড়লোকের বন্ধ দরজার ওপর মাথা ঠুকে ঠুকে পড়ে নেতিয়ে। রাস্তার কুকুরের সাথে খাবার কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়। দৌলতদারের দৌলতখানার জাঁকজমক, সৌখিন পথচারীর পোশাকের চমক ও তার চলার ঠমক দেখতে দেখতে কেউ চোখ বোজে। ঐশ্বর্যারোহীর গাড়ীর চাকায় নিষ্পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারায় কেউ বা।

যারা ফিরে আসে তারা বুকভরা আশা নিয়ে আসে বাঁচবার। অতীতের কান্না চেপে, চোখের জল মুছে তারা আসে, কিন্তু মানুষের চেহারা নিয়ে নয়। তাদের শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে। পেট গিয়ে মিশেছে পিঠের সাথে। ধনুকের মত বাঁকা দেহ—শুষ্ক ও বিবর্ণ। তবুও তারা ভাঙা মেরুদণ্ড দিয়ে সমাজ ও সভ্যতার মেরুদণ্ড সোজা করে ধরবার চেষ্টা করে। ধুক্‌ধুকে প্রাণ নিয়ে দেশের মাটিতে প্রাণ সঞ্চার করে, শূন্য উদরে কাজ করে সকলের উদরের অন্ন যোগায়। পঞ্চাশের মন্বন্তরে হুঁচোট-খাওয়া দেশ আবার টল্‌তে টল্‌তে দাঁড়ায় লাঠি ভর দিয়ে।

দুটি ছেলে-মেয়ের হাত ধরে জয়গুনও গ্রামে ফিরে আসে। বাইরের ছন্নছাড়া জীবন এতদিন অসহ্য ঠেকেছে তার কাছে। কতদিন সে নিজের গ্রামে ফিরে আসার তাগিদ অনুভব করেছে, স্বপ্ন দেখেছে। ছায়া-সুনিবিড় একখানি বাড়ী ও একটি খড়োঘর তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে কতদিন! কিন্তু বৃথাই ডেকেছে। তার সে বাড়ী, সে ঘর আর তার নয় এখন। দুর্ভিক্ষের মহাগ্রাসে কোথায় গেল বাড়ী আর কোথায় গেল ঘর। বেচে নিঃশেষ করে দিল উদরের জ্বালা মেটাতে।

জয়গুন গ্রামে আসে একটি মাত্র আশা নিয়ে। ছাড়া ভিটে আছে একটা। সে তার আট আনা অংশের মালিক। বাকী আট আনার অংশীদার তার নাবালেগ ভাই-পো শফী। শফীকে নিয়ে শফীর মা-ও আসে। তাদেরও মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই। শেষে স্থির হয়—এই ছাড়া ভিটেটার ঝোপ-জঙ্গল সাফ করে দু-ভিটেতে দু'খানা ঘর তুলে আবার তারা সংসার পাতবে।

কিন্তু এটা যে সূর্য-দীঘল বাড়ী।

জয়গুন ও শফীর মা পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

পূর্ব ও পশ্চিম সূর্যের উদয়াস্তের দিক। পূর্ব পশ্চিম প্রসারী বাড়ীর নাম তাই সূর্য-দীঘল বাড়ী। সূর্য-দীঘল বাড়ী গ্রামে ক্বচিৎ দু'একটা দেখা যায়। কিন্তু তাতে কেউ বসবাস করে না। কারণ, গাঁয়ের লোকের বিশ্বাস সূর্য-দীঘল বাড়ীতে মানুষ টিকতে পারে না। যে বাস করে তার বংশ ধ্বংস হয়। বংশে বাতি দেয়ার লোক থাকে না। গ্রামের সমস্ত বাড়ীই উত্তর-দক্ষিণ প্রসারী।

সূর্য-দীঘল বাড়ীর ইতিহাস ভীতিজনক। সে ইতিহাস জয়গুন ও শফীর মা'র অজানা নয়।

সে অনেক বছর আগের কথা। এ গ্রামে হাতেম ও খাদেম নামে দুই ভাই ছিল। ঝগড়া করে ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হয়ে যায়। খাদেম আসে সূর্য-দীঘল বাড়ীটায়। বাড়ীটা বহুদিন থেকেই খালি পড়ে ছিল।

এখানে এক সময়ে লোক বাস করত সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা বংশ রক্ষা করতে পেরেছিল কিনা কেউ জানে না। তবুও লোকের ধারণা সূর্য-দীঘল বাড়ীতে নিশ্চয়ই বংশ লোপ পেয়ে থাকবে। নচেৎ এ রকম বিরান পড়ে থাকবে কেন?

যাই হোক, শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে খাদেম এসে সূর্য-দীঘল বাড়ীতে বসবার আরম্ভ করে। কিন্তু একটি বছরও ঘুরল না। বর্ষার সময় তার এক জোড়া ছেলে-মেয়ে পানিতে ডুবে মারা গেল। সবাই বুঝতে পারল —বংশ নির্বংশ হওয়ার পালা শুরু হল এবার। বুড়োরা উপদেশ দিলেন বাড়ীটা ছেড়ে দেয়ার জন্য। বন্ধু-বান্ধবরা গালাগালি শুরু করল—আল্লার দুইন্যায় আর বাড়ী নাই তোর লাইগ্যা। সূর্যু-দীগল বাড়ীতে দ্যাখ্ কি দশা অয় এইবার।

খাদেমের মনেও ভয় ঢুকে গিয়েছিল। সাতদিনের মধ্যে ঘর-দুয়ার ভেঙে সে অন্যত্র উঠে যায়। জয়গুনের প্রপিতামহ খুব সস্তায়, উচিতমূল্যের অর্ধেক দিয়ে তার কাছ থেকে বাড়ীটা কিনে নেয়। উত্তরাধিকারের সেই সূত্র ধরে জয়গুন ও শফী এখন এ বাড়ীর মালিক।

ঐ ঘটনার পর অনেক বছর পেরিয়ে গেছে। এতদিনের মধ্যে আর কোন লোক ভুলেও এ বাড়ীতে আসেনি। আকালের সময় জয়গুন ও শফীর মা এ বাড়ীটাই বিক্রী করতে চেয়েছিল। কিন্তু সূর্য-দীঘল বাড়ী কেউ কিনতে এগোয়নি। তখন এ বাড়ীটা বিক্রী করতে পারলেও জয়গুনের স্বামীর ভিটেটুকু রক্ষা করা যেত; ছেলেমেয়ের বাপ-দাদার কবরে আজ আবার বাতি জ্বলত।

বহুদিনের পরিত্যক্ত বাড়ী। সর্বত্র হাঁটু সমান ঘাস, কচুগাছ, মটকা ও ভাঁট-

শেওড়া জন্মে অরণ্য হয়ে আছে। বাড়ীর চারপাশে গোটা কয়েক আমগাছ জড়াজড়ি করে আছে। বাড়ীর পশ্চিম পাশে দুটো বড়া বাঁশের ঝাড়। তা ছাড়া আছে তেঁতুল, শিমুল ও গাবগাছ। গ্রামের লোকের বিশ্বাস— এই গাছ-গুলোই ভূত-পেত্নীর আড্ডা।

অনেকদিন আগের কথা। সন্ধ্যার পর গদু প্রধান সোনাকান্দার হাট থেকে ফিরছিল। তার হাতে এক জোড়া ইলিশ মাছ। সূর্য-দীঘল বাড়ীর পাশের হালট দিয়ে যেতে যেতে সে শুনতে পায়—অই পরধাইন্যা, মাছ দিয়া যা! না দিলে ভালা অইব না।

প্রথমে গদু প্রধান ভ্রূক্ষেপ করেনি। পরে যখন পায়ের কাছে ঢিল পড়তে শুরু করে, তখন তার হাত থেকে মাছ দুটো খসে পড়ে যায়। সে 'আউজু-বিল্লাহ' পড়তে পড়তে কোন রকমে বাড়ী এসেই অজ্ঞান।

রহমত কাজী রাত দুপুরের পর তাহাজ্জুদের নামাজ পড়বার জন্যে ওজু করতে বেরিয়ে ফুটফুটে জোছ্‌নায় একদিন দেখেছে—সূর্য-দীঘল বাড়ীর গাব-গাছের টিকিতে চুল ছেড়ে দিয়ে একটি বউ দু'পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক দৃষ্টিতে সে চেয়ে দেখছিল। চোখের পলক ফেলে দেখে আর সেখানে বউ নেই। একটা ঝড়ো বাতাস উত্তর-পশ্চিম কোণাকুণি করম আলী হাজীর বাড়ীর ওপর দিয়ে চলে গেল। পরের দিনই করম আলী হাজীর 'পুতের বউ' কলেরায় মারা যায়। দু'দিন পরে তার হালের তিনটা তরতাজা গরু কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে খতম।

আরও অনেকের সাথেই নাকি অনেক বেশে ভূতের দেখা হয়েছে। সূর্য-দীঘল বাড়ীর ভূতের গল্পের অন্ত নেই। তাই দিন-দুপুরেও পারতপক্ষে এ বাড়ীর পাশ দিয়ে কেউ হাঁটে না।

বাড়ীটার বড় আকর্ষণ একটা তালগাছ। এত উঁচু তালগাছ এ গাঁয়ের লোক আর কোথাও দেখেনি। কত শিশুর পরিচয় হল তালগাছটির সঙ্গে। তারা বুড়ো হল, জীবন লীলা সাঙ্গ করল। তাদের কত উত্তরপুরুষও গেল পার হয়ে। কিন্তু তালগাছটি তেমনি দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীর মত। কালের সাক্ষী হয়ে শত ঝড়-ঝাপটা উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাথা উঁচু করে।

তালগাছটি এ-এলাকার গর্বের বস্তু। চর-অঞ্চলে বিশেষ করে বক্তবলীর চরে গেলে কথায় কথায় যখন কুল-কৌলীন্যের তর্ক ওঠে, তখন এখানকার লোক এ তালগাছটির নজির দেখায়। কেউ কেউ নিজেদের বনেদীপনা জাহির করে। তারা এ রকম করে বলে —আমরা অইলাম গিয়া সাবেক মাড়ির ভর্দলোক, বুঝলানি মিয়া? আমাগো ঘর বহুত পুরানা। ঐ আসমাইন্যা তালগাছটা সাক্ষী। দেহাও দেহি, অত বুড়া আর ডাঙ্গর গাছ একটা তোমাগ মুল্লুকে? ও হো, ঠন্‌ ঠন্‌। তোমাগ এই দিগের বড় তালগাছ আমাগ

গেরামের খাজুর গাছের হমান। আমাগডা সেই মইষখালির হাটের তনে দেহা যায়। তোমাগডা অত বড় অইব ক্যামনে? এইত হেদিনের চর এইডা। এইহানে আগে আছিল গাঙ। তোমরা অইলা চরুয়া ভূত—বাইল্যা মাডির তরমুজ, ইত্যাদি।

অপর পক্ষ রাগ করে না। তারা সব সময় এ সাবেক মাটির বাসিন্দাদের কৌলীন্য স্বীকার করে। বহু টাকা খরচ করেও এদের ছেলে মেয়ের সাথে সম্বন্ধ করতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করে। এখানকার বহু কালো কুৎসিত মেয়ে চরের সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরে বিকিয়ে যায় এ কারণেই।

জয়গুন ও শফীর মা সাত-পাঁচ ভেবে এ বাড়ীতে বাস করার আশা ছেড়েই দিয়েছিল। ছেলেমেয়ের অমঙ্গল আশঙ্কা করেই নিরস্ত হয়েছিল বিশেষ করে। কিন্তু একদিন এক নামকরা ফকির—জোবেদ আলী এ সঙ্কট থেকে তাদের উদ্ধার করে। সূর্য-দীঘল বাড়ীর চারকোণে চারটা তাবিজ পুঁতে এসে সে জানিয়ে দেয়—এই বার চউখ বুইজ্যা গিয়া ওড বাড়ীতে। আর কোন ডর নাই। ধূলাপড়া দিয়া ভূতপেত্নীর আড্ডা ভাইঙ্গা দিছি। চাইর কোণায় চাইড্যা আলীশান আলীশান পাহারাদারও রাইখ্যা আইছি। সব আপদ বিপদ ওরাই ঠেকাইব। বাড়ীর সীমানার মইদ্দে ভূত-পেত্নী; জিন-পরী ব্যারাম-আজার—কিচ্ছু আইতে পারব না।

জয়গুন ও শফীর মা খুশী হয় ফকিরের ওপর। শফীর মা তার ভিক্ষার ঝুলি খালি করে সোয়া সের চাল দেয় তাকে। জয়গুন দেয় সোয়া পাঁচ আনা পয়সা। কিন্তু ফকিরের মন ওঠে না। শফীর মা অনুনয় করে—আমরা গরীব-কাঙ্গাল মানু। এই এর বেশী আর কি দিতে পারি?

—বাড়ীতে যখন ঠিকঠাক অইবা তখন একটা পিতলের কলসী দিও। আর হোন, তোমার বাঁশ ঝাড়ে বড়্ড়া বাঁশ ছাখলাম। এক জোড়া বাঁশ দিও আমারে। আমারে দিলে আখেরে কাম দিব।

জয়গুন ও শফীর মা আপত্তি করে না।

ফকির আবার বলে—হোন, আর এক কথা। বচ্ছর বচ্ছর কিন্তু পাহারা বদলাইতে অইব। যেই চাইরজন এইবার রাইখ্যা গেলাম, হেইগুলো কমজোর অইয়া যাইব সামনের বচ্ছর। বোঝতেই পার, দিনরাইত ভূত-পেত্নীর লগে যুদ্ধু করা কি সোজা কাণ্ড!

সূর্য-দীঘল বাড়ী মানুষের হাত লেগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। জয়গুন ও শফীর মা আজেবাজে গাছ-গাছড়া বিক্রি করে টাকার আমদানী করে। তাতে অন্ধকার বাড়ীটায় আলোর আমদানীও হয় বেশ। নিজেদের ঝাড়ের বাঁশ কেটে খুঁটি হয়। খড়ের চালা ও পাটখড়ির বেড়া নিয়ে দু'ভিটেয় দু'খানা ঘর ওঠে। ঘর নয় ঠিক—ঝুপড়ি। রোদ বৃষ্টি ঠেকানোর আদিম ব্যবস্থা।

বছর বছর পাহারাদার বদলিয়ে তিনটি বছর কেটে গেল সূর্য-দীঘল বাড়ীতে। কোন বিপদ-আপদ আজ পর্যন্ত আসেনি। ম্যালেরিয়া জ্বর ছাড়া অসুখ-বিসুখও হয়নি ছেলেমেয়েদের। এ জন্যে ফকিরের দোষ দেয়া যায় না। ম্যালেরিয়া জ্বর কোন্ বাড়ীতে নেই ?

এবার আবার পাহারাদার বদলাবার সময় হয়েছে। একদিন জয়গুনের ঘরে বসে শফীর মা বলে—ফকিরের যে আর ছ্যাহা মিলে না আইজকাইল। হেইযে কবে আইয়া গেছে। আর একবার হাত-হপনেও ছ্যাহা দিয়া গেল না, আমরা বাইচ্যা আছি না মইর‍্যা গেছি। কেমুনতরো মানু। এদিকে বছর যে ঘুইরা গেল। কলসীডা না দেওনে বেজার অইছে বুঝিন্।

ফকিরকে তাদের প্রতিশ্রুত পেতলের কলসী দেয়া হয়নি এ পর্যন্ত। সাত স্বপনেও তার দেখা না পাওয়ার কারণ এটা নয়। কারণ অন্য একটা। জয়গুন ছাড়া আর কেউ তা জানে না।

কলসীর তাগাদা দিতে ফকির মাঝে মাঝে আসত। জয়গুন ও শফীর মা নিজেদের উপস্থিত অক্ষমতা জানিয়ে কিছুদিন সবুর করবার অনুরোধ জানাত। শফীর মা বাড়ী থাকলে কখনো লাউ-কুমড়ো, কখনো শসা-বেগুন—যখনকার যা নিয়ে সে খুশী মনে ফিরে যেত। শফীর মা বাড়ী না থাকলে সেদিন জয়গুনের ঘরের দোরগোড়ায় যেন শিকড় গেড়ে বসত সে। উঠবার নামও করত না। কোনদিন সে বলত – এক খিলি পান ছ্যাও বেয়ান।

জয়গুনকে 'বেয়ান' আর হাসুকে 'জামাই' বলতে শুরু করেছিল সে।

প্রথম থেকেই লোকটার কথাবার্তা, ভাবগতিক জয়গুনের কাছে সুবিধের মনে হয়নি। সামান্য একটা পেতলের কলসীর জন্যে এত ঘনঘন কেন সে আসে? 'বেয়ান' বলে এত ঘনিষ্ঠতাই বা করতে চায় কেন ? কি মতলব ?

জয়গুনের মনে সন্দেহ। কিন্তু কিছু বলার উপায় ছিল না। যে লোকটা এত উপকার করল, তাকে কটু কথা বলতেও বাধে।

জয়গুন একটা আস্ত পানে সুপারী, চুন ও খয়ের দিয়ে এগিয়ে দিত। ফকির বলত, বেয়াইরে খিলি বানাইয়া দিলে বুঝিন জাইত যায়, না ? কত দিন খোশামুদ কইর‍্যাও তোমার আতের এক খিলি পান খাইতে পারলাম না। মইর‍্যা গেলেও হায়-আফসোস থাকব।

জয়গুন কোন উত্তর দিত না।

পান খেতে খেতে ফকির নানা রকমের কথা বলতে শুরু করত। কখনো কোন প্রশ্ন করে উত্তরের জন্য হা করে থাকত। উত্তর না পেয়ে আবার শুরু করত। মাঝে মাঝে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠত লাগামছাড়া হাসি। জয়গুন এ অস্বস্তিকর হাসি ঠাট্টায় জ্বলে উঠত মনে মনে। পিছ-দুয়ার দিয়ে এক সময়ে সরে পড়ত।

একদিন রাত্রে বৃষ্টি মাথায় করে কোথা হতে ফকির এসে হাজির। জয়গুন পান খেতে বসেছিল। ফকিরের আগমনে সে একটু সচকিত হয়ে ওঠে। ছেলেমেয়ে দুটি ঘুমিয়ে পড়েছে। শফির মা-ও বাড়ী নেই আজ।

ফকির দরজার ওপর বসে পান চিবোতে চিবোতে এক সময়ে বলে—বেয়ানের আতের পান খাইতে কি মুলাম! এক্কেরে মুখের স'থে মিশ্যা যায়। যেই আতের পান এত মুলাম, হেই আতখানও না জানি কেমুন। শরীরখানও বুঝিন তুলতুল করে তুলার মতন।

ফকির হাসে। জয়গুনের সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। শক্ত একটা কিছু বলতে চায়। কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না।

—দেহি না, বেয়ান! বলতে বলতে সে এগোয়—দেহি না তোমার নরম আতহানে কি সেহা আছে।

জয়গুন পিছিয়ে যায়। বেড়ার সাথে গিয়ে ঠেকে।

—দেহি না আতহান। নওল মুরগীর মতন পলাও ক্যান! ছিঃ, ছিঃ!

ফকির হাত বাড়াতেই জয়গুন হাতের কাছের চুনের ঘটটা ছুঁড়ে দেয় ফকিরের মুখের ওপর। চেঁচিয়ে ওঠে—কুত্তার পয়দা! বাইর অ, বাইর অ ঘরতন।

এ ব্যাপারের পর জোবেদ আলী ফকির আর তার চুন-কালির মুখ সূর্য-দীঘল বাড়ীতে দেখায়নি।···

জয়গুন শফীর মা'র কথার উত্তর দেয়—বেজার অইলে অউক গিয়া। দিমু না কলসী, কাম নাই আর পাহারাদারের।

শফীর মা জয়গুনের ভাবান্তরের কারণ খুঁজে পায় না। জয়গুন এমন অকৃতজ্ঞ হল কেমন করে? আর পাহারাদার ছাড়া সূর্য-দীঘল বাড়ীতে থাকবার সাহসই বা তার কোত্থেকে হল?

দুই

পাশাপাশি পিঁড়ে বিছিয়ে বসে দুটি ভাই-বোন—হাসু ও মায়মুন। জয়গুন পান্তা বেড়ে ছেলে ও মেয়ের সামনে দুটো থালা এগিয়ে দিয়ে নিজেও একটা নিয়ে বসে। মায়মুন আড়চোখে হাসুর থালার দিকে চায়। রোজ সে এমনি চেয়ে দেখে। রোজই হাসুকে বেশী করে খেতে দেয় মা। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলার সাহস তার হয় না। জয়গুন বুঝতে পেরে নিজের পাতের একমুঠো ভাত দিয়ে বলে—বিছমিল্লা বুইল্যা মোখে দে। দেখ্‌বি এই দুগ্‌গায়ই প্যাট ভইর্‌যা যাইব।

—বিছমিল্লা।

হাসুও বলে—বিছমিল্লা।

প্যাচপেচে পান্তাভাত। পোড়া মরিচ মেখে কালো করে নেয়। খেতে খেতে জয়গুন সারাদিনের কাজের ফরমাস করে যায় মায়মুনকে। ঘর ঝাঁট দেয়া, থালাবাসন মাজা; পানি আনা ইত্যাদি।

—ভাত আছে আর, মা? হাসু বলে।

ভাতের হাঁড়িটা হাসুর থালার ওপর উপুড় করে ঢেলে জয়গুন বলে,—খাইয়া নে, পরাণ ঠাণ্ডা অইব।

শুধু পানিতে থালা ভরে যায়। মায়মুনের পাতে তার আধাটা ঢেলে দিয়ে লবণ দিয়ে ঘেঁটে চুমুক দেয় হাসু।

খাওয়ার পরে জয়গুন পানের ডিবা নিয়ে বসে। পেট ভরে দুটি ভাত খেতে না পেলেও পানটা একটু মুখে দিলে তবু ভালো লাগে।

হাসু কোযার পানি সেচে ডাকে—মা, শিগ্‌গির। গাড়ী কইলাম আইয়া পড়ল বইল্যা।

জয়গুন বাঁশের চোঙা থেকে পাঁচটা টাকা বের করে নেয়। এই টাকা ক'টিই তার মূলধন। ময়মনসিং থেকে সস্তায় চাল এনে সে গাঁয়ে বিক্রি করে। এই করে টাকা প্রতি এক সের সোয়া সের মুনাফা হয় প্রতি খেপে। আঁচলে সব ক'টি টাকা বেঁধে চটের দুটো ঝুলি হাতে বেরিয়ে পড়ে সে তারপর।

দশ বছরের মেয়ে মায়মুন। কিন্তু সাত বছরের বেশী বলে মনে হয় না। হাঁটতে গেলে পাক খেয়ে পড়ে যাবে মনে হয়। একা একা কাজ করতে ভালো লাগে না ওর। কিন্তু কাজের কোনটা বাকী রাখলে চুল এক গাছও মাথায় থাকবে না, সে জানে। শীর্ণ শরীরটাকে টেনেটুনে কোন রকমে মাজা-ঘষা করে, বদনা ভরে ভরে সাত আটবারে পানির কলসীটা ভরে সে।

আজ হাঁস দুটো ছাড়তে গিয়ে খাঁচার নিচে ডিম দেখে মায়মুনের আনন্দ আর ধরে না। তাদের হাঁস ডিম দিয়েছে আজ নতুন। কি সাদা আর বড় বড়! দু'হাতে দুটো ডিম নিয়ে সে নাচতে আরম্ভ করে। লাফাতে লাফাতে সে বাইরে আসে। দৌড়ে যায় শফীর মা'র ঘরে। ডাকে—মামানী গো, অ-মামানী, ছ্যাহ্ কি সোন্দর আণ্ডা। আমাগ আঁসে পাড়ছে। উল্লাস যেন সে ধরে রাখতে পারে না।

—দেহি দেহি—বলে মামী হাত পেতে ডিম দুটো নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। তারপর হেসে বলে—ভালো আণ্ডা অইত। পয়লা বারের অইলেও ডাঙর-ডোঙর অইছে! আষ্ট পয়সা কইর‍্যা বেচ্‌তে পারবি এক একটা।

—না গো মামানী, এই আণ্ডা বেচ্‌তাম না।

—খাবি ?

—ও হোঁ। বাচ্চা ফুডাইমু।

—বেইশ, বেইশ! মামী উৎসাহ দিয়ে বলে।

ডিম দুটো তুষের হাঁড়ির মধ্যে রেখে মায়মুন বাড়ীর এদিক ওদিক খুঁজে গাছের শুকনো ডাল ভাঙে। আজ তার কাজ করতে খারাপ লাগে না। আর দিনের চেয়ে অনেক বেশী লাকড়ি যোগাড় করে ফেলল সে।

বিকেলবেলা মায়মুন বড়শী নিয়ে তেঁতুলতলা গিয়ে বসে। যাবার আগে আণ্ডা দুটো আর একবার দেখে যায় দুই চোখে। সন্ধ্যা পর্যন্ত ও বসে থাকে বড়শী নিয়ে। পিঠালী সব শেষ হয়ে যায়। কিন্তু মাছ ওঠে মাত্র একটা টেংরা, তিনটে পুঁটি আর কয়েকটা ডানকানা। মাছগুলো যেন ওর চেয়েও চালাক হয়ে গেছে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘরে সাঁঝ-বাতি দেখিয়ে আবার নিবিয়ে দেয় মায়মুন। আবছা অন্ধকারে বসে মাছ কয়টা কুটে লবণ দিয়ে রাখে।

রাত ন'টা দশটা পর্যন্ত অন্ধকারে ওকে একা বসে থাকতে হয় প্রায়ই। মায়মুনের বড় ভূতের ভয়। কোন কোন দিন সে শফীর মা'র ঘরে গিয়ে কেচ্ছা শোনে। তার পান ছেঁচে দেয়। কিন্তু আজ সে দুপুর বেলা বেরিয়ে গেছে, এখনো ফেরেনি। ভিক্ষে করে খায় সে। মাঝে মাঝে বাড়ীও আসে না। মায়মুন দোরের ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়ে চুপ-চাপ পড়ে থাকে।

রাত গোটা নয়ের সময় হাসু আর হাসুর মা আসে। শব্দ পেয়ে মায়মুন মাথার ওপর থেকে কাঁথা সরিয়ে ভয়ে ভয়ে চোখ মেলে।

মায়মুন এবার লাফ দিয়ে ওঠে। খুশীতে আটখান হয়ে সে বলে —মা, মা, আমাগ আঁসে আণ্ডা পাড়ছে। বলতে বলতে সে বের করে আনে ডিম দুটো। হাসু খুশী হয়ে ওঠে। হাতে নিয়ে দেখে, কী সুন্দর সাদা আর বড়।

হাসু বলে—কাইলঅই আণ্ডা বিয়ান খাইমু মা, পান্তা ভাত দিয়া।

—ইস! বাচ্চা ফুডাইমু আমি। প্রতিবাদ করে বলে মায়মুন।

জয়গুন বলে—ওহোঁ। পয়লা দিনের আণ্ডা। আণ্ডা দুইডা জুম্মার ঘরে দিয়া আবি নামাজের দিন।

ভাই-বোন দু'জনেরই মুখের হাসি মিলিয়ে যায়।

জয়গুন তাড়াতাড়ি চুলো ধরায়। রাতের জন্য মুঠ মেপে ছয়মুঠো ও ভোরের জন্য আরো ছয়মুঠো চাল নিয়ে সে হাঁড়ি বসায় চুলোর উপর। ছেলেকে হুকুম দেয় কয়েকটা কুমড়ো পাতা তুলে আনতে। নিজে সে যায় না। বাচ্চা-কাচ্চার মা; রাত-বিরাতে গাছের ফল-পাতা ছিঁড়তে নেই।

ভাত ফুটিয়ে মায়মুনের ধরা মাছ কয়টা রাঁধতে দেরী হয় না।

তিনটি বাসনে ভাত বাড়ে জয়গুন, আর আন্দাজ করে—হাঁড়িতে কতটা

আছে। ফেনটাও ভাগাভাগি করে নেয়। খেতে খেতে হাসু বলে—ফেনডাত খুব ঘন মা, মিডা মিডা লাগে।

—নয়া আউশ যে। এর লাইগ্যাইত আউশ চাউল আন্‌লাম। দরেও হস্তা। ফেনডাও অয় ভালা। কিন্তু ভাতে বাড়ে না এক্কেরেই। অ্যারে হাসু, নারায়ণগঞ্জে চাউল কি দর দেখলিরে আইজ?

—ট্যাহায় দেড় সের, মা।

—কি পোড়ার ত্যাশ ত্যাখ্ দেহি! উত্তুরে এড়ুক হস্তা না অইলে হুকাইয়া তেজপাতা অইয়া যাইতাম না? আইজ আড়াই সের ভাও আনলাম। আমন চাউল দুইসের কইর‍্যা।

—আমি একদিন তোমার লগে উত্তুরে যাইমু মা।

—ওহোঁ কাম কামাই দিয়া তোমার উত্তুরে যাওনের দরকার নাই বা'জান।

খাওয়া শেষ হলে জয়গুন হাঁড়ির ভাতগুলোতে পানি ঢেলে রাখে। ছেলে-মেয়ের জন্যে তেলচিটে একটা লম্বা বালিশ নামিয়ে দেয়। হাসু ও মায়মনে শুয়ে পড়ে। জয়গুন পানের ডিবাটা নিয়ে বসে এবার। আজ আর পানের ডিবা নেয়ার কথা মনে ছিল না তার। গাড়ীর মধ্যে ছমুর মা'র কাছ থেকে চেয়ে একবার মুখে দিয়েছে একটু। আর সারা দিনের মধ্যে সে পান খায়নি। তবু হাসু অনুযোগ দেয়—পান খাওয়া ছাইড়্যা দ্যাও, মা। পান আর আনতাম না আমি। চাইর পয়সা কি কম?

পান খাওয়া সে অনেক কমিয়েছে। চার পয়সার পানে দু'দিন যায় আজকাল।

পান চিবোতে চিবোতে সে সারাদিনের দুঃখ-কষ্ট ভুলে যেতে চেষ্টা করে।

রাত অনেক হয়েছে। কুপিটা নিবিয়ে সে শুয়ে পড়ে।

তিন

আজকের ডিম দুটো মায়মুনের। সে বাচ্চা ফুটাবে। মা রাজী হয়েছে। সারা রাত তার ভাল ঘুম হয়নি। তার ছোট মনে কত কল্পনা জেগেছে। হাঁসের বাচ্চা হবে, সেগুলো বড় হবে, ডিম দেবে—ফকফকে সাদা ডিম। সেই ডিমের থেকে আবার বাচ্চা হবে। নানা রঙের হাঁসে তাদের খাঁচা ভরে যাবে। স্বপ্নেও সে দেখে—রঙ-বেরঙের হাঁসের সারি চলছে ধানখেতের মাঝ দিয়ে। ডিম কুড়িয়ে কুড়িয়ে সে একটা হাঁড়ি ভরে ফেলেছে।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই সে হাঁস দুটো ছাড়তে যায়। ঠিক ঠিক দুটো

ডিমই পেড়েছে আজো। ডিম দুটো তুলে সে তুষের হাঁড়ির মাঝে রেখে দেয় আলাদা করে। সেখানে আগের দু'দিনের আরো চারটে রাখা হয়েছে। এক দুই করে গুণে দেখে মায়মুন একবার। তারপর হাঁস দুটো ছেড়ে দিয়ে সে চেয়ে থাকে। দু'তিন বার ডানা ঝাঁপটা মেরে হাঁস দুটো ভেসে যায় ধান-খেতের দিকে। মায়মুনের চোখ তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। হাত-মুখ ধুয়ে মায়মুন ঘরে আসে। ডিম দুটো সে বুকের সাথে চেপে ধরে খুশীতে। জয়গুন বলে—অই রহম কইর‍্যা ধইর‍্যা রাখলেঅই বাচ্চা অইব ? বেবাকগুলা আণ্ডা লইয়া আয় আমার কাছে। বাছাই কইর‍্যা দেই। যেই আণ্ডাটা লম্ফা, হেইডায় অইব আঁসা, আর যেইডা গোল হেইডায় অইব আঁসী।

গোল দেখে দুটো ডিম বেছে মায়মুনের হাতে দিয়ে সে আবার বলে—অই পাড়ায় গিয়া ছাখ, কেউর মুরগীর উমে দিতে পারস যদি। হাসুও যা ওর লগে। তোর আর এই বেলা কামে যাওন লাগত না।

এ কথায় রীতিমত খুশী হয়ে ওঠে হাসু।

জয়গুন আরো বলে—দুফরে যাবি জুম্মার ঘরে। আণ্ডা চাইড্যা দিয়া আ'বি।

—চাইড্যাঅই ! হাসু আশ্চর্য হয়ে যায়—তুমি না হেদিন কইল্যা, পয়লা দিনেরডা কেবল ?

—দুইডা আণ্ডা জুম্মার ঘরে কেমন কইর‍্যা দেই, পাগল ? এক আলির কমে—

—আমরা খাইমু না বুঝিন একটাও ?

—তুই আছস তোর প্যাট লইয়া।

খেয়ে দেয়ে সবাই বেরিয়ে পড়ে।

বর্ষার সময় বাড়ীর চারিদিকে থাকে পানি। বিলের মাঝে একটা দ্বীপের মতো যেনো। এ সময়ে নৌকা ছাড়া চলবার উপায় থাকে না। তারা সকলে তাদের কোষায় চড়ে ওপাড়ায় যায়। জয়গুন নামে মোড়ল বাড়ীর ঘাটে। সেখানে সে মাঝে মাঝে মোড়লদের ধান ভানে, চিড়া কোটে, ঘর লেপে দেয়।

হাসু ও মায়মুন পাড়াময় ঘুরে শেষে দিয়ে এল ডিম দুটো।

সাতদিন পরে বসবে সোনা চাচীর মুরগী। তার ফুটবে চোদ্দটা ডিম। তবু সে বলেছিল—দুটো বাচ্চা হলে তাকে একটা দিতে হবে। অনেক কাকুতি-মিনতি করায় শেষ পর্যন্ত সে রাজী হয়েছে।

গ্রামের মসজিদ। জুম্মার নামাজ হচ্ছে। হাসু বাইরে দাঁড়িয়ে দেখে। সব লোক এক সঙ্গে উঠছে, বসছে, সেজদা দিচ্ছে। হাসুর কেমন ভয় হয়। তারও নামাজের বয়স হয়েছে। সে ভাবে—বারো বছরের হলেই তো নামাজ পড়তে হয়।

নামাজ শেষ হলে হাসু গামছায় বাঁধা ডিম কয়টা নিয়ে এগোয়। একজন নামাজী শিন্নি বিলিয়ে দিচ্ছিল সকলের মধ্যে। গামছা খুলে হাসু তার হাতে দিয়ে দেয় ডিম কয়টা।

ইমাম সায়েবের চোখ এড়ায় না। তিনি ডেকে বলেন—নিয়া আস আণ্ডা কয়ডা এদিকে।

কাছে যেতে আবার বলেন—যাও, দিয়া আস গিয়া আমার ওখানে। কে দিল হে ?

—ঐ যে ঐ ছ্যাঁড়া। আঙুল দিয়ে দেখায় সে।

একজন বলে—সূর্য-দীগল বাড়ীর।

আর একজন বলে—চিনেন না হুজুর ? জব্বর মুন্সীর পোলা।

ইমাম সায়েব চমকে ওঠেন—ও-ওই। তওবা! তওবা! হারাম! হারাম!

তিনি ডিম ক'টার দিকে তর্জনীর নির্দেশ দিয়ে বলেন—নিয়া যাও জলদি আমার কাজ থ্যাইকা। মসজিদের মধ্যে কে আনল এই আণ্ডা ?

ফিরাইয়া ত্থাও অহুনি। বেপর্দা আওরতের চীজ। ছি! ছি! ছি! —তাঁর চোখে মুখে ঘৃণার তীব্রতা ফুটে ওঠে।

একজন ইঙ্গিত করে—একলা একলা সে মমিনসিং যায় টেরেনে কইর‍্যা। কী হিম্মত!

ইমাম সায়েব বলেন—দেখলা মিয়ারা, ইমানদারকে খোদাওন্দ করিম হারাম থ্যাইকা কিভাবে হেফাজত করেন।

আর একজন বলে—জব্বর মুন্সী কত পরহেজগার আছিল। খোদার এমন পিয়ারা আছিল। আর তার পরিবার—

হাসু রেগে ওঠে মনে মনে। একবার ইচ্ছে হয়—দেয় ছুঁড়ে ডিম ক'টা ইমামের মুখের ওপর। কিন্তু সাহস হয় না। ডিম ক'টা নিয়ে সে বেরিয়ে আসে।

কোষাটাকে সে জোরে বেয়ে নিয়ে যায়। আজ অনেকগুলো ট্রেন ও ষ্টীমার ফাঁক গেল। দুটোর জাহাজ ধরা চাই-ই চাই। দুটো মোট পেলেও ছ'আনার কাজ হবে।

দুটোর জাহাজ, আর বিকেল পাঁচটার ট্রেন ধরে সে আসে বাজারে। ডিম চারটে সে বিক্রি করেই ফেলবে। কেন দেবে সে মসজিদে ? মা জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে, জুম্মার ঘরে দেয়া হয়েছে।

ডিম ক'টা সাত আনায় বেচে সে পাঁচ আনায় চারগাছা কাঁচের চুড়ি কেনে মায়মুনের জন্যে, আর নিজের কোমরে পয়সা বেঁধে রাখবার জালি কেনে একটা। বাকি দু'আনার এক আনায় কেনে একটা চরকি ও এক আনায় চারটে তিলের কদমা।

সন্ধ্যার দিকে সে কোষা ভিড়ায় একটা বাড়ীর ঘাটে। চারদিকে চেয়ে সে চুপিচুপি ডাকে—কাসু, অ-কাসু!

বছর সাতেকের একটি ছোট্ট ছেলে লাফিয়ে এসে ওর গলা জড়িয়ে ধরে। হাসু ওকে কোলে তুলে নেয়। তারপর ওর মুখে একটা কদমা দিয়ে বলে—ছাখ, কেমুন মিষ্টু। এই চরকিডাও তোর লাইগ্যা আনছি। ছাখ কেমুন সোন্দর ঘোরে।

কাসু খুশী হয় খুব। হাসু বলে—যাবি তুই আমার লগে? মা তোর লাইগ্যা কত কান্দে দিন-রাইত!

—ক্যার মা?

—তোর মা। আমার মা।

—হুঁ, মিছা কথা।

—না বলদ, সত্যই।

মা'র কথা শুনে কাসু যেন কেমন হয়ে যায়। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। তার চোখ টলটল করে। কাসু কিছু বুঝে উঠতে পারে না। সে জানে, তার মা মরে গেছে। বাপ তো সেই কথাই বলে সব সময়।

—যাইমু তোমার মা'র কাছে—কাসু বলে।

—আমার মা যে তোরও মা অয়, বলদ।

—কে? কেডারে অইহানে? কাসুর বাপ করিমবকৃশ চীৎকার করে ওঠে। তেড়ে আসে লাঠি হাতে। —খাড়া হারামির পয়দা, কানকথা দিতে আইছস আমার পোলারে!

কাসুকে কোল থেকে নামিয়ে বাকী কদমা তিনটে ওর হাতে দিয়ে প্রাণভয়ে দৌড় দেয় হাসু। কোষাটা ঠেলে দিয়ে চড়ে বসে। প্রাণপণে বেয়ে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

কাসুর বাপ করিমবকৃশ পানির কিনারা পর্যন্ত এসে বাধা পায়। চেঁচিয়ে বলে—আবার এই মুহী পাও বাড়াইলে আড্ডি গুড়া কইর‍্যা ফালাইমু। মানুষ চিন না বজ্জাতের বাচ্চা!

তারপর এদিক ওদিক চেয়ে কয়েকটা মাটির ডেলা নিয়ে ছুঁড়তে থাকে ওর দিকে। একটা ডেলা এসে হাসুর পিঠের ওপর পড়তেই সে লাফ দিয়ে পানিতে পড়ে যায়। কোষার আবডালে থেকে আত্মরক্ষা করতে থাকে। করিমবকৃশ চলে যেতেই সে কোষায় চড়ে জোরে লগির খোঁচ দেয়।

কাসুদের বাড়ী থেকে শব্দ শোনা যায়, সাথে সাথে গর্জনও—হারামজাদা, কদমা দিয়া ভুলাইতে আইছস। আবার আইলে বাপের মরণ দেহাইয়া ছাইড়্যা দিমু।

আবার শোনা যায়—চরকি! ছাখ, অহন চরকিবাজি কেমুন লাগে।

হাসুর চোখে পানি আসে। পিঠের ব্যথার কথা ভুলে যায় সে। কাসু যে তারই ভাই এক মা'র পেটের ভাই। হোক না বাপ ভিন্ন। কিন্তু মা-তো একজনই। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, সে আর এ মুখো হবে না। তার জন্যেই কাসু আজ মার খাচ্ছে।

মোট বয়ে আজ ছ'আনা পেয়েছে হাসু। বাড়ী এসেই মা-কে দেয় তিনটে দু'আনি।

মা বলে—এই পাইলি আইজ ?

—গেলাম তো দুফরের পর, আরঅ ? বলেই হাসু বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। মায়মুনকে ডাকে—দেইক্যা যা মায়মুন, কি আনছি।

নতুন কিছু দেখবার জন্যে মায়মুনের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হাসু চুড়ি চারগাছা ওর হাতে পরিয়ে দেয়। মায়মুনের মুখ আনন্দে ভরে যায়।

জয়গুন বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেয়ে বলে—চুড়ি কিনলি, পয়সা পাইলি কই ?

—আইজ পথে যাওনের কালে একটা পোঝা পাইয়া গেলাম। আমতা আমতা করে হাসু।

—চুড়ি তোমারে কে কিনতে কইছে ? রাগতস্বরে বলে জয়গুন।

হাসু কোন উত্তর দেয় না। তার এই চুপ করে থাকাটা জয়গুনকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। দাঁত কিড়মিড় করে বলে—খাইতে নাই শুইতে রাঙ্গা পাড়ি। আইজ রাইতে ভাত নাই তোর কপালে।

মায়মুন মুখ কালো করে দূরে সরে যায়। হাসু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েই থাকে।

জয়গুন আবার বলে—আণ্ডা কই ?

—জুম্মার ঘরে দিয়া দিছি। বলেই হাসু শিউরে ওঠে।

—জুম্মার ঘরে! তুমি বুঝছ, আমি কিছুই জানমু না ? মোড়ল বাড়ীর তন বেবাক শুইন্যা আইছি। হুজুর ফিরাইয়া দিছেন আণ্ডা।

হাসুর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। চাপে পড়ে সত্য কথাটাই বলে সে —বেইচ্যা ফালাইছি।

—পয়সা দে।

—চুড়ি কিনছি, পয়সা রাহনের জালি আর—

জয়গুন এবার বেরিয়ে আসে বাঘিনীর মত।

—আর কাসুর লাইগ্যা চরকি আর কদমা।

বাঘিনীর তেজ মিলিয়ে যায় শুধু একটা নামে। কি মধুর নাম! কাসু! রাগের মাঝে বাৎসল্যের হঠাৎ আবির্ভাব সে সহ্য করতে পারে না। সরে যায় সেখান থেকে।

খাওয়ার সময় আবার তাদের কথা হয়। মা বলে—কাসু কতহানি ডাঙর অইছে রে।

—মায়মুনের মত অত বড় অইছে।

একটা নিশ্বাস বেরিয়ে আসে। হাসু ও মায়মুন চকিত হয়ে মা'র দিকে চায়। হাসু এবার অন্য কথা পাড়ে—তুমি আর বাইরে যাইও না, মা। মাইনষে কত কথা কয়, বেপর্দা—

ছেলের পাকামি দেখে জয়গুন ধমক দেয়—বাইরে যাইমু না! ঘরে আইন্যা কে মোখের উপর তুইল্যা দিব?

—আমি যা পাই। না পাইলে না খাইয়া মইর‍্যা যাইমু। হেই অ ভালা, ত মাইনষের কতা আর সয় না।

হাসু সারাদিনে দশ-বারো আনা পায় মোট বয়ে। এ দিয়ে তিনটি প্রাণীর এক বেলাও চলে না। জয়গুন বাধ্য হয়েই ঘরের বার হয়েছে আজ অনেক দিন। সে বাড়ী বাড়ী ঘর লেপে, ধান ভানে, চিড়া কোটে। সস্তায় চাল কিনতে যায় উত্তরে। গাড়ীতে ক'রে যায়, ভাড়া লাগে না। গাঁয়ের লোকের কথায় তার গা জ্বালা করে। তাদের নিষেধ মেনে চললে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে, সে জানে।

জয়গুন এবার বলে—খাইট্যা খাইমু। কেওরডা চুরি কইর‍্যাও খাই না, খ'রাত কইর‍্যাও খাই না। কউক না, যার মনে যা'—

কঠিন তার কণ্ঠস্বর।

কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হয়—সে খোদার কাছে পাপ করছে। বাড়ীর বার হয়ে খোলা রাস্তায় সে পুরুষদের মাঝ দিয়ে হেঁটে বেড়ায়। গাড়ীতে কত বেগানা মানুষের মাঝে বসে সে চলে। বেপর্দা মেয়েলোকের কি আজাব হয়, সে জানে। তার প্রথম স্বামী—হাসুর বাপ মুনশী ছিল। পুঁথি পড়ে শোনাত দোজখের শাস্তির বিবরণ। পুঁথির কয়েকটা লাইন তার আজো মনে পড়ে,—

মুখের ছুরত যার পুরুষে দেখিবে,
বিছা বিচ্ছু, জোঁকে তারে বেড়িয়া ধরিবে।
যে চুল দেখিবে তার পুরুষ অচিন,
সাপ হইয়া দংশিবে হাশরের দিন।
যে নারী দেখিবে পর-পুরুষের মুখ,
শকুনি গিরধিনী খাবে ঠোকরাইয়া চোখ।

জয়গুন শিউরে ওঠে। সাপ, বিছা, জোঁক···! তার প্রথম স্বামীর মুখখানাও মনে পড়ে যায়। কী সুন্দর চাপদাড়ি শোভিত মুখখানা জব্বর মুনশীর। বেহেস্ত-দোজখের কত কথাই সে বলত। বেহেস্তে কত সুখ! আর দোজখ! দোজখের নামে আর একবার আঁতকে ওঠে সে। তার বিশ্বাস,

হাশরের দিন জব্বর মুন্সী কিছুতেই তাকে তার বেপর্দার জন্য নিজের স্ত্রী বলে স্বীকার করবে না।

তারপর তার মনে পড়ে করিম বক্শের কথা। জব্বর মুন্সীর মৃত্যুর পর জয়গুন তার মান-ইজ্জতের ভার দিয়েছিল তার ওপর। কিন্তু সে তা রাখতে পারেনি। দুর্ভিক্ষের বছর বিনা দোষে সে জয়গুনকে তালাক দেয়।

'পুত্র সে হাতের লাঠি বংশের চেরাগ।
কন্যা সে মাথার বোঝা কুলে দেয় দাগ॥'

সমাজের এই নীতি-নির্দেশে তিন বছরের ছেলে কাসু রয়ে গেল করিম বক্শের কাছে। আর মায়মুন ও কোলের মেয়েটির পরিত্যক্তা মায়ের কোল ছাড়া আর কোথাও আশ্রয় রইলো না।

কোলের মেয়েটি দুর্ভিক্ষের বছর মারা যায়।

হাসু ও মায়মুনকে নিয়ে ভেসেই চলছিল জয়গুন। কিন্তু নিজের চেষ্টায় অকুল পাথারে কুল সে পায়। লজ্জাশরম বিসর্জন দিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজে। তাকে বাঁচতে হবে, ছেলে মেয়েদের বাঁচাতে হবে—এই সঙ্কল্প নিয়ে আকালের সাথে পাঁচ বছর সে লড়াই করে আসছে।

আরো অনেক কিছু ভাবছিল জয়গুন। ছেলের ডাকে তার ধ্যান ভেঙে যায়।

—তুমি খাও না, মা?

ছেলেমেয়ের মুখের দিকে চেয়ে মমতায় তার বুক ভরে ওঠে।

দুটি কচি মুখ। এদের বাঁচাতেই হবে। ধর্মের অনুশাসন সে ভুলে যায় এক মুহূর্তে। জীবন ধারণের কাছে ধর্মের বারণ তুচ্ছ হয়ে যায়, মিথ্যে হয়ে যায় তার কাছে।

চার

রেল-রাস্তার ধারে মা-কে নামিয়ে দিয়ে হাসু কোষাটা ডুবিয়ে রাখে। কেউ নিয়ে যেতে পারে এই ভয়ে সে তার ওপর কচুরী ঢাকা দিয়ে রাখে। এ ব্যাপারে খুবই হুঁশিয়ার সে। কারণ, বর্ষার দিনে কোষাটা তাদের চলাফেরার একমাত্র সম্বল।

হাসু গাড়ীর দেরী বুঝে রেল-রাস্তা ধরে দক্ষিণমুখী পথ নেয় নারায়ণগঞ্জের দিকে। রেল ও স্টীমারের বড় স্টেশন সেখানে। আজ তিন মাইল রাস্তা হেঁটেই যেতে হবে। আর সব দিন গাড়ীর পা-দানের ওপর দাঁড়িয়ে হাতল ধরে দিব্যি এতটা রাস্তা সে পার হয়ে যায়।

জয়গুন ফতুল্লা স্টেশনে এসে দাঁড়ায়। ট্রেন আসার অনেক দেরী। সে এদিক ওদিক খুঁজে দু'জন সাথী যোগাড় করে নেয়।

ন'টার ট্রেন আসে দশটারও পরে। এখানে এক মিনিটের বেশী দাঁড়ায় না গাড়ী। ভিড়ের মাঝে সঙ্গিনীদের সাহায্যে জয়গুন কোন রকম উঠে পড়ে। মেঝেতে একটু জায়গা নিয়ে থলে বিছিয়ে বসে। জয়গুনের সাথী দুটি—গেদির মা, লালুর মা-ও বসে নীচে। গেদির মা-র সাথে পাঁচ বছরের গেদি। লালুর মা বিরক্ত হয়, বলে—মাইয়াহান বাড়ীতে রাইক্যা আইতে পার না, গেদির মা?

—বাড়ীতে কার কাছে রাহি বইন?

—ভিড়ের মইধ্যে নিজেরই চলনই দায়, তুমি আবার—

—তুমি কি ফ্যালাইয়া দিতে কও মাইয়াডারে! গেদির মা রুষ্ট হয়ে বলে।

—না, না, হেইডা কইমু ক্যাঁ? কইছিলাম তোর কষ্ট দেইক্যা।

কষ্ট অইলে আর কি করমু বইন? অদিষ্টে কষ্ট থাকলে খণ্ডাইব কে?

—এক কাম কর না? মাইয়াডার বিয়া দিয়া দে!

—মোডে পাঁচ বচ্ছর বয়স। এত শিগ্‌গিরেই!

—এই আর কি এমুন? মাইয়াডাও খাইতে-লইতে পারব, তুইও নিভাবনায় থাকবি।

জয়গুন রাস্তাঘাটে সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। সে কথা বড় কয় না। এখনও লজ্জাকে সে জয় করে উঠতে পারেনি। তার কান অন্য দিকে। ওপাশে আলোচনা হচ্ছে—দেশ স্বাধীন হবে, চাল সস্তা হবে, এই সব।

চার পাঁচজন যাত্রীর মধ্যে তখন আলোচনা বেশ জমে উঠেছে। জনকয়েক একটা বাংলা খবরের কাগজের দিকে ঝুঁকে আছে। বাকী সবাই শুনছে ওপাশের আলোচনা।

একজন বলে- এই বচ্ছর আহালের নমুনা দেহা যায়। চাউলের দর এক্কই চোডে আটতিরিশ অইছে।

আর একজন সায় দিয়ে বলে—আহাল অইব না আবার! মানুষ কি আর মানুষ আছে? পাপে ডুইব্যা গেছে দ্যাশ। দেইক্যো মিয়ারা আধা মানুষ মইর‍্যা যাইব এই বার। পাপ, পাপের বাপেরেও ছাড়ে না।

অন্য একজন বলে—পঞ্চাশ সনের চাইয়া বড় আহাল অইব এই বার।

একজন প্রতিবাদ করে—না মিয়া, দ্যাশ স্বাদীন অইব। আর দুকখু থাকব না কারুর, হুনছি আমি। স্বাদীন অইলে চাউলও হস্তা অইব। আগের মত ট্যাকায় দশ সের।

—ও মশাই আপনের খবরিয়া কাগজে কি লেখছে? জোরে জোরে পড়েন না, হুনি।

যে লোকটি খবরের কাগজ পড়ছিল, সে জোরে পড়তে আরম্ভ করে, ১৫ই আগস্টের মধ্যে ভারতবাসীর হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবে—

—ও মশাই, ওডা ক্যার ছবি? একজন জিজ্ঞেস করে।

—জিন্নাহ্ সা'বের। খবরের কাগজের পাঠক বলে।

আবার তর্ক। একজন বলে, জিন্না সা'বই রাজা অইব। খুব বড় মাথা লোকটার।

অন্য দিক থেকে আর একজন বলে—গান্ধী অইব এই দেশের রাজা।

এ নিয়ে কিছুক্ষণ তর্ক চলে। মাঝ থেকে একজন বলে—সুভাষ বসু থাকলে সে-অই রাজা অইতেন।

—আইচ্ছা মামু, স্বাদীন অইলে খাজনা দিতে অইবনি?

—না, না, খাজনা দিলে আবার স্বাদীন অইল কি?

অপর একজন বলে—না মিয়া, রাজার খাজনা মাপ নাই, দিতেই অইব।

জয়গুন মন দিয়ে শোনে সব কথা। একটি কথাই তার ভালো লাগে, আশা জাগে মনে—চাল সস্তা হবে, কারো কোন কষ্ট থাকবে না।

—হাসুব মা!

জয়গুন তাকায়। লালুর মা বলে—মোখ বুইজ্যা বইয়া আছ যে, এই দিকে কত কি অইয়া গেল!

—কি? উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করে জয়গুন।

—আমার লালুর বিয়া ঠিক কইর‍্যা ফেললাম। এই গ্যাহো বউ। লালুর মা গেদিকে আরো কাছে টেনে নেয়।

জয়গুন একটু হাসে শুধু। লালুর মা বলে—বউ কেমন অইব গ্যাখ দেহি।

—ভালা। জয়গুনের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

লালুর মা খুশী হয়। সে গেদির মা-কে বলে—গয়নার লাইগ্যা অমন কইর‍্যা না গো। আমি ত কইছি—কানে কানফুল নাকে নাকফুল আর বালি, আতে বয়লা, পায়ে ব্যাঁকখাড়ু দিমু। তয় রূপার দিতে পারতাম না, বইন!

—ওহোঁ, হেইডা না। তুমি বেবাক কেমিকল আর বেলী দিয়া চালাইতে চাও! না বইন, রূপার একপদ জিনিস দিতেই অইব। আর গলার অড়কল আর কোমরের নাবীসঙ্গ। আমার গ্যাদা মাইয়া। নাবীসঙ্গ না অইলে কেমুন গ্যাহা যাইব।

ঢাকা স্টেশন। লোক নামে, লোক ওঠে। ভিখারীও ওঠে নানা রকমের—কানা, খোড়া, বোবা। একজন অন্ধ করুণ সুরে বলে যায়—

যে জন করিবে দান অন্ধ মিসকিনে
বকশিশ পাইবে সেই হাশরের দিনে॥
একপয়সা যেই দিবে খুশী খোশালিতে।

সত্তুর পয়সা পাইবে আল্লার রহমতে ॥
বরকত হইবে তার রুজি-রোজগারে।
বাল-বাচ্চা জিন্দা রবে সুখের সংসারে ॥
আ — ল্ল — হ !

অন্ধ হাত পাতে—দ্যান বাবা একটা পয়সা।

একজন যাত্রী বলে—এক পয়সা কি আর আছে বাপু ?

মসজিদের চাঁদার জন্য আসে লোক। রীতিমতো বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করে—জয়নগর মসজিদের জন্য দান করুন। এর ফল পাবেন কেয়ামতের দিন, পুলসেরাতের দিন। এই টাকায় বেহেস্তে ফুল-বাগিচা হবে, দালান বালাখানা হবে।

দু'এক পয়সা কেউ দেয়, অনেকেই দেয় না। কেউ বলে—এদের এই একটা পেশা।

গাড়ী চলতে আরম্ভ করলে লালুর মা আবার মুখর হয়ে ওঠে—নারীসঙ্গ দিতে পারতাম না বিয়াইন, গলার অড়কলও না। তয় খাড়ু না দিয়া পায়ের ঝুনঝুনি দিমু বউরে, ছোড বউ আমার আঁটব ঝুন্‌ঝুন্‌ কইর‍্যা !

জয়গুন ভাবছিল অনেক কিছু। সে নিজের ছেলের বিয়ে দেবে—বউ আসবে ঘরে। মেয়ের বিয়ে দেবে—পরের বাড়ী যাবে সে। লালুর মা-র শেষ কথায় সে একটু হাসে।

—হে অইলে শাওন মাসের পয়লা দিয়া-ওই বিয়া অইব। কি কও বিয়াইন ?

গেদির মা একটু চিন্তা করে বলে—ওহোঁ, শাওন মাস আমার মাইয়ার জর্ম মাস।

—হে অইলে পরের মাসে ?

—পরের মাসে ? না না। ভাদ্দর মাসে বিলাই পার করে না ঘরতন। আর আমি বুঝিন্‌ মাইয়া পার করুম ? কী যে তোমার আক্কল !

—সত্য অইত। আমার মনেই আছিল না ভাদ্দর মাস। হে অইলে পরের মাসেই অইব, কেমুন গো ?

গেদির মা রাজী হয়।

একটা ছেলে সুর করে বলে যাচ্ছে—

খেয়ে যান মজার নাশ্‌তা,
নিয়ে যান সস্তা সস্তা,
এক আনায় দুই বস্তা।

ছেলেটার ছড়া বলার ভঙ্গী আর বস্তার বিরাটত্ব দেখে যাত্রীরা সব হো-হো করে হেসে ওঠে। কেউ কেউ দু'একটা প্যাকেট কিনে চানাচুরের মজাটাও

পরখ করে। লালুর মা দুই পয়সা দিয়ে একটা প্যাকেট কিনে ভাবী বউকে দেয়। গেদি খুশী হয়।

একটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। গাড়ী একটা স্টেশনে থামতেই জয়গুন, লালুর মা ও গেদির মা নেমে পড়ে। ময়লা কাপড়ে ভিখারী ভেবে টিকেট কালেক্টর এদের দেখেও দেখে না। এখান থেকে বাজার কিছু দূরে, প্রায় এক মাইল। লালুর মা তার বউকে কোলে করে নিয়ে বেয়ানকে সাহায্য করে।

বাজারে এসে তিনজনে তিন রকমের চাল কেনে তারা। কিন্তু একই দরের —টাকায় আড়াই সের করে।

তারপর বাজার থেকে বেরিয়ে তারা গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করে। ফিরে যাওয়ার গাড়ী আবার বিকেল চারটায়।

গাড়ীর সময় আন্দাজ করে তারা ওঠে। রওয়ানা দেবার আগে তিনটা ঝুলির চাল মিশিয়ে ছয়টা ঝুলির মধ্যে ভরে। ঝুলিতে এক রকমের অনেক চাল দেখলে রেল-বাবুরা সন্দেহ করে, টিকেট চায়। এ রকম করে মিশিয়ে ভিক্ষার চাল বলে চালিয়ে দেয় তারা। টিকেটও লাগে না।

গেদিকে স্টেশনের বাইরে তিনটা ঝুলির পাহারায় রেখে তারা তিনজন তিনটা ঝুলি হাতে স্টেশনে আসে। কিন্তু সদর দরজা দিয়ে নয়, রেলের লাইন ধরে ধরে। টিকেট কালেক্টরকে এড়িয়েই যেতে চায় সব সময়। কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও বাকী তিনটে ঝুলি নিয়ে আসার সময় প্ল্যাটফরমে রেল-পুলিশ তাদের আটকায়। বলে—দেখি, দেখি।

সকলের মুখ শুকিয়ে যায়। লালুর মা বলে—ভিক্কার চাউল।

সেপাই চাল দেখে বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলে—ভিক্ক্যার চাওয়াল, এতন্যা! হামি কিছু বোঝে না! চল্ থানামে। জান্‌তি নেহি এক জিল্লাকা চাওয়াল দুসরা জিল্লামে যানে হুকুম নেহি আছে?

লালুর মা সাহসী। বলে—ছাইড়্যা দ্যাও, সিপাইজী।

সেপাই বলে—তব্ আয় হামার ছঙ্গে।

প্ল্যাটফরম থেকে দূরে গিয়ে সেপাই প্যান্টের বিরাট পকেট খুলে ধরে। বলে—দে হামার পাকিট ভরদে। রেশন মে চাওয়াল মিলতে আছে না, খালি খুদি।

লালুর মা তিনটা ঝুলির থেকে মুঠ ভরে আধ সের খানেক চাল সেপাইর দুই পকেটে ঢেলে দেয়। সেপাই এবার ছেড়ে দেয়।

জয়গুন পরিশ্রান্ত, ট্রেনের দুলানিতে ঝিমুনি আসে। কাঠের সাথে মাথা ঠেকিয়ে সে ঘুমিয়েই পড়ে। গাড়ী গেণ্ডারিয়া স্টেশন ছাড়লে গেদির মা-র ধাক্কায় তার ঘুম ভাঙে।

তাড়াতাড়ি তারা ঝুলিগুলোর মুখ দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধে। ট্রেনের

হুইস্‌ল বাজে। ফতুল্লা স্টেশন এসে যাবে এক্ষুণি। তারা ঝুলি হাতে জানালা দিয়ে মুখ বাড়ায়! হাসু কোষাটা পানি থেকে তুলে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। নির্ধারিত স্থানে কুল গাছটার কাছে গাড়ী আসতেই তারা সব ক'টি ঝুলি জানালা দিয়ে ভুপদাপ বাইরে ফেলে দেয়।

ফতুল্লা স্টেশনে নেমে তারা কুলগাছ তলায় আসে। হাসু ঝুলিগুলো কুড়িয়ে জড়ো করেছে এক জায়গায়। মা-কে দেখে বলে—আইজ গাড়ী বড় দেরী করল, মা? বেইল ঘরে যায় যায়, এমুন সময় আমি আইছি।

—কই আর এমুন দেরী?

জয়গুন ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে সময়ের টের পায়নি। আটটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ।

—কি দর আন্‌লা মা চাউল?

—আড়াই সের ভাও। কিন্তুক দর যেন চড়া চড়া ঠেক্‌লরে। তুই কত পালি, বা'জান?

—বার আনা। আমি কিন্তু দুই পয়সার চিনাবাদাম খাইছি, মা। এই কয়ড়া আনছি মায়মুনের লাইগ্যা।

জয়গুনের মন প্রসন্ন হয় ছেলের ওপর। সে বলে—জলদি কইর‍্যা চল যাই।

পাঁচ

বয়সের সাথে সাথে মানুষের মেজাজ পরিবর্তন হয়। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে করিম বক্‌শের মেজাজ ঠাণ্ডা না হলেও কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছে বৈকি! তা না হলে তার শড়কির হাতল ঘুণে ধরতে পায়। চার বছর বোধ হয় লাঠিটায়ও তেল মাজা হয়নি। তেলের দামও বেড়েছে, আর লাঠির দরকারটাও কমেছে অনেক। মাটির ওপর পুরনো লাঠিটা ঠুকতে ঠুকতে তার নিজের ও লাঠির বিগত শৌর্যের কথা মনে পড়ে। পেতলে মুঠি-বাঁধা এই লাঠিটা যৌবন-কাল থেকেই তার পথ-চলার সাথী। কারণ, মেজাজের জন্যে শত্রু কম ছিল না তার। তাই বুড়োর মত লাঠি হাতে সে চলত। এমন কি ঘুমোবার সময় পাশেই থাকৃত লাঠিটা। লাঠিটা হাতে নিলেই তার একদিনের কথা মনে পড়ে।

—দুপুর রাত্রে যাত্রা গান শুনে এসেছিল সে। মেহেরনের দরজা খুলে দিতে দেরী হয়েছিল। তাকে হাতের এই লাঠিটা দিয়েই সে মেরেছিল। গর্ভবতী মেহেরন সে আঘাত সহ্য করতে পারেনি। তারপর গলায় রশি বেঁধে গাবগাছে লটকিয়ে সে রেহাই পেয়েছিল। হাজারখানেক টাকা অবশ্য খরচ করতে হয়েছিল এ-ব্যাপারে।

তার আরো মনে হয় আজকাল,—লাঠিটা হয়ত হাশরের দিন তার বিরুদ্ধেই সাক্ষী দেবে খোদার কাছে।

মেহেরন করিম বক্শের প্রথম স্ত্রী।

তারপর সে জয়গুনকে বিয়ে করে। তার ওপরও তার বাহুবলের কসরত চলে ছয় বছর! তার শরীরের কোন অঙ্গ বোধ হয় তার প্রহারের কাছে রেহাই পায়নি।

জয়গুনের শাশুড়ী সান্ত্বনা দিত—ওয়াতে কি অইছে বউ! মরদগুনে যেই পিডে মারব, হেই পিড বিস্তে যাইব। যেই আতে, যেই পায় মারব, বেবাক বিস্তে যাইব। তুই বুঝিন্ কাডুরিয়ার বউর কিচ্ছা হোনস নাই? তয় হোন্: রসুল-করিম একদিন বিবি ফাতেমারে কইল—"অমুক জাগায় এক কাডুরিয়া থাকে। তার বউ আট বিস্তের বড় বিস্তে যাইব।" বিবি ফাতেমা জিগাইল—"ক্যান্ যাইব?" রসুল-করিম কইল—"যাও, গিয়া দেইখ্যা আহ একদিন।" বিবি ফাতেমা কাডুরিয়ার বাড়ী গিয়া ছ্যাহে কি, ওমা! ঘরের দুয়ারে হাজাইয়া থুইছে দাও, লাডি, ঠ্যাঙ্গা দড়ি। বিবি ফাতেমা কাডুরিয়ার বউরে জিগাইল—"অত লাঠি ঠ্যাঙ্গা এমুন কইর‍্যা রাখছে কে?" সে জ'ব দিল—"আমি।" জিগাইল, "ক্যাঁ?" জ'ব দিল—"যদি সোয়ামীর খেজমতে তিরুডি অয়, তয় এই লাঠি দিয়া আমারে পিডাইব। কামের সময় কোতায় লাডি বিচ্‌রাইব? এই এর লাইগ্যা আতের কাছে আইন্যা রাখ্‌ছি। জিগাইল, "দাও রাখছ ক্যাঁ?" জ'ব দিল—"যদি মনে লয় কাটব।"

—ছ্যাখ, কেমুন জননা আছিল। জয়গুনের শাশুড়ী মাথা নাড়ত। জয়গুন এ কেচ্ছা বহু আগেই শুনেছে। মুসলমান ঘরের বউ এ কেচ্ছা শোনেনি, অস্বাভাবিক।

জয়গুন হয়ত সহ্য করত। কিন্তু করিম বক্শ তাকে সে সুযোগ দেয়নি।

বছর দুই আগে করিম বক্শ আবার বিয়ে করেছে। তবে আঞ্জুমনের কপাল ভালো। আগের সে মেজাজ আর নেই। বিশেষ করে পয়লা ঘরের ছেলে রহিম বক্শ বাপের অত্যাচারে শ্বশুর বাড়ী উঠে যাওয়ার পর, তার মেজাজ অনেকটা স্তিমিত হয়ে গেছে।

কিন্তু বাহুবল যত কমেছে, বাক্যবল তত নয়। ঝগড়া আর প্যানপ্যানিটাই আজকাল আছে। প্রতিপক্ষ ঝগড়ায় পিছপাও নয় বলে, খেতে বসতে ঝগড়া হয়। দিন বড় বাদ যায় না। যেদিন বাদ যায়, সেদিন পাড়ার সবাই সচকিত হয়। একজন আরেক জনকে জিজ্ঞেস করে—করিম বক্শ বুঝি বাড়ীতে নাই আইজ?

সেদিন আঞ্জুমন এক বেদেনীর কাছ থেকে মেয়ের অসুখের জন্যে কিসের তাবিজ রাখছিল। করিম বক্শ হাট থেকে এসে দেখেই আগুন। জিজ্ঞেস

করে—কিয়ের তাবিজ, অ্যাঁ? আমারে টোনা করবি নি?

তার এই এক অকারণ সন্দেহ।

আঞ্জুমন রেগে যায়, বলে—হ টোনা করমু। ভেড়া বানাইয়া রাখমু তোমারে।

—হারামী! বৈতাল মাগী! বলে সে উঁচু করে পুরানো লাঠিটা।

—আত উডাইও না কইতে আছি। খইয়া পড়ব আত। কুড়-কুষ্ঠ অইব।

করিম বক্শ লাঠিটা নামায়। তারপর বলে—জয়গুন তো তোর মতন আছিল না। মাইর‍্যা চ্যাবড়া কইরা ফেলাইলেও উঁহু করত না। আর তোর গায়ে ফুলের টোকা না দিতেই—

জয়গুনকে ছেড়ে দেবার পর কাসুকে নিয়ে করিম বক্শ বিব্রত হয়েছিল। একদিন করিম বক্শের এক নিঃসন্তান বোন এসে কাসুকে নিয়ে যাওয়ায় সে নিশ্চিন্ত হয়।

কাসু ফুপুর বাড়ীতে এক রকম ভালোই ছিল।

কিছুদিন আগে ফুপু মারা যাওয়ার পর করিম বক্শ তাকে নিজের বাড়ী নিয়ে এসেছে। কিন্তু এ বাড়ীর ঝগড়াটে আবহাওয়ায় এসে কয়েক দিনেই সে মন-মরা হয়ে গেছে। এখানে আদর করে কেউ কোলে নেয় না তাকে। ডাকেও না কেউ। এখানে কারো মুখেই হাসি নেই। তাই ওর নিজের হাসিও কোথায় মিলিয়ে গেছে। কারো মুখের দিকে চেয়েই সে ভরসা পায় না। শুধু একজনকেই তার পছন্দ হয়েছে। সে হাসু। তার এখানে আসবার পর সে তিনদিন এসেছে। কিছুদিন ধরে তারও দেখা নেই।

হাসুর দেওয়া কদমা করিম বক্শ পানিতে ফেলে দিয়েছিল। চরকিটা ভেঙে দিয়েছিল পায়ের তলায় ফেলে। কাসুকেও থাপ্পর মেরেছিল পিঠের ওপর। ঐ দিন থেকেই কাসু আরো মুষড়ে পড়ে। করিম বক্শ সেদিন তাকে একটা ঘোড়া কিনে দিয়েছিল! কাসু তা ছোঁয়নি।

হাসু আর আসবে না, তার ছোট মনেই সে অনুমান করেছিল সেদিন। হাসুর আসার পথের দিকে চেয়ে তার দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

করিম বক্শ ঐ দিন থেকেই হুঁশিয়ার হয়েছে। হাসুকে তার সন্দেহ হয়। ছোড়াটা ভারী ফেরেববাজ। ফুসলি দিয়ে কাসুকে নিয়ে যেতে পারে, এই তার ভয়। তাই সে যেখানে যায়, প্রায় সাথে সাথেই রাখে কাসুকে। বড় ছেলেটা শ্বশুর বাড়ী পালিয়েছে। কাসুই এখন একমাত্র ভরসা।

খেত-পাথারে জোয়ারের পানি আসার সাথে সাথে করিম বক্শের মনে আসে এক জোয়ার। নাওয়া-খাওয়া ভুলে সে কোঁচ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় মাঠে মাঠে! তার ঐ এক ঝোঁক। তার যৌবনের হিংস্র স্বভাবের অবশিষ্ট এই মাছ শিকার। কয়েকদিনের চেষ্টাও অনেক সময় বিফলে যায়। তবু তার ধৈর্যের

অভাব নেই। রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে সে ধান খেতের ভেতর মাছের সন্ধান করে বেড়ায়।

এ বছর তার সুবিধা হয়েছে আরো। আউশ ধান পেয়েছে মণ সাতেক। এ ধানে প্রায় আমন ধর ধর হবে। কারণ ছেলে ও ছেলে-বৌ চলে যাওয়ায় খাবার লোক কমেছে। গাই দুই সের দুধ দেয়। আট আনা করে রোজ এক টাকা পাওয়া যায়। সুতরাং তার আর ভাবনা নেই। সারাদিনে সে শুধু বাজারে গিয়ে দুধ বেচে! কাজ আরো আছে বটে। কিন্তু মাছ ধরার নেশায় সে সব কাজের খেয়ালই হয় না। ছেলে থাকতে সব কাজ সে-ই করত।

তিনদিন অবিরাম বৃষ্টিপাতের পর আজ দুপুরের দিকে রোদ উঠেছে। ভাত খাওয়ার পর করিম বক্‌শ ডাকে—ফুলির মা, এক ছিলিম তামাক ছ্যাও দেহি জলদি। বাতাসের রাগ নাই আইজ। মাছ ছ্যাখতে সুবিধা অইব।

আঞ্জুমন কল্কেয় আগুন দিয়ে ফুঁ দিতে দিতে আসে। করিম বক্‌শের হাতের হুঁকোটায় কল্কেটা বসিয়ে দিয়ে বলে—আর তো কাম নাই তোমার। পাড়ের জাগডা ছ্যাখছ?

—হুঁ দেখম্ হনে আইজ। নিরাগ বাতাসে আইজ চকে যা মাছ ছ্যাহা যাইব!

—বাটনা বাইট্টা রাহুম হে-অইলে, কি কও?

করিম বক্‌শ খোঁচাটা নীরবে সহ্য করে। মাছ সে চার-পাঁচ দিনেও একটা পায় না। তাই এ টিটকারী।

কোঁচ-যুতি হাতে সে নৌকায় ওঠে। পাশের বাড়ীর হারুনকে ডেকে নেয় নৌকা বাইতে। কাসুকেও রেখে যায় না বাড়ীতে।

এদিকের পানি কালো, তাই স্বচ্ছ। মাছ মারতে অসুবিধা। শিকারী মাছ দেখবার আগেই, মাছ শিকারীকে দেখতে পেয়ে পালায়।

দাড়া-পথ বেয়ে তারা খালের ধারের একটা ধান খেতে ওঠে। নদীর পানি খাল দিয়ে এসে এখানকার পানি ঘোলা করে রাখে।

করিম বক্‌শ নিশ্চুপ ওত পেতে থাকে। চারিদিকে চোখ বুলায় একটা ধান গাছ নড়ে কিনা। কখনো কোঁচ নিয়ে, কখনো যুতি হাতে নিয়ে সে তাক করে।

মাছের কোন লক্ষণ না পেয়ে হাতের ইশারায় সে আর এক খেতের দিকে নৌকা চালাবার নির্দেশ দেয়।

এক জায়গায় কয়েকটা ধান গাছ নড়ে ওঠে। আর যায় কোথা! ঝুব্‌ঝুব্ ঝপ! কোঁচ দিয়ে কোপ দেয় করিম বক্‌শ।

আরো অনেক লোক জমা হয়েছিল মাছ মারতে। একজন বলে আইজ আর মিয়াবাই খালি আতে যাইব না, বোঝতে পারছি।

করিম বক্‌শ কোঁচটা তুলে নিরাশ হয়। বলে—দুশ্ শালা! আইজ

যাত্রাডাই খারাপ। আর কেওর কোঁচের নিচে পড়তে পারলি না? আমার-ডার নিচেই—

—কি মিয়া, কাছিম নাহি? একজন জিজ্ঞেস করে।

—আর কইও না মিয়া। আইজ যাত্রাডাই খারাপ।

—যাত্রা খারাপ! ক্যাঁ? বউর মোখ দেইক্যা যাত্রা কর নাই মিয়া?

হারুন ও কাসু দু'জনেই উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। হারুন নিজের মাথা থেকে মাথলাটা কাসুকে দিয়ে বলে- ঘাম দিছেরে, ইস্! মাথলাডা মাথায় দে, রউদ লাগব না।

আরো কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে যখন আর মাছের সাড়া পাওয়া যায় না, তখন করিম বক্শ বলে—কি জানি এইর'ম অইতাছে ক্যান্। তোরা কাপড় উল্ডা কইর‍্যা পিন্দা নে দেহি কি অয়।

করিম বক্শ নিজেও গামছা পরে লুঙ্গি ছাড়ে। লুঙ্গির দিক পালটিয়ে নিয়ে আবার পরে।

এবার করিম বক্শ এক চাক গজার মাছের পোনার পেছনে লাগে। কিন্তু গজারটা খুবই চালাক। পোনার কাছাকাছিও ঘেঁষে না। মাছটা বড়ই হবে খুব, করিম বক্শ অনুমান করতে পারে। পোনাগুলিও বড় হয়েছে। অনেকক্ষণ পরে পরে এক সঙ্গে ভেসে ওঠে। এক জায়গায় থাকলেও কথা ছিল। এইখানে দেখা যায়, তারপর আর নেই। কোথায় গেল? কোথায় গেল? করিম বক্শ এদিক-ওদিক তাকায়। কিছুক্ষণ পরে ভুস্ করে ভেসে ওঠে। করিম বক্শ মুখে কিছু না ব'লে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। হারুন আস্তে আস্তে অনুসরণ করে।

পোনাগুলি খেতের পর খেত পার হয়ে চলেছে। ঘোলাপানি ছেড়ে আসে কালো পানিতে। করিম বক্শ তবুও হাল ছাড়ে না।

এবার একটা জলা খেত পার হয়ে পোনাগুলি ধান খেতে ঢোকে। করিম বক্শ কোঁচটা রেখে যুতি হাতে নিয়ে আবার মনোযোগ দেয়। পেছনে হাত দেখিয়ে নৌকার গতি মন্থর করার নির্দেশ দেয়। নিজেও সে নুয়ে এক হাতে ধানগাছের গোছা ধরে নৌকার গতিরোধ করে।

কাসু!

হাসুর ডাক। করিম বক্শ চমকে ওঠে। চেয়ে দেখে সে জয়গুনের বাড়ীর কাছাকাছি এসে পড়েছে।

জয়গুন, মায়মুন ও হাসু দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে এদিকে। জয়গুন এখন গাছের আড়ালে চলে গেছে।

কাসু ডাক শুনে দাঁড়িয়েছিল। করিম বক্শ বলে—ব' হারামজাদা! বইয়া পড়! পইড়্যা যাবি।

তারপর হারুনের কাছ থেকে লগি নিয়ে জোর ঠেলায় সে নৌকা ছুটায় বাড়ীর দিকে।

জয়গুন চেয়ে থাকে যতক্ষণ নৌকাটা দেখা যায়। কাসুকে তিন বছরের রেখে সে এসেছিল। এখন সে বড় হয়েছে। কথা বলতে শিখেছে। কিন্তু দূর থেকে তার মুখখানা আদৌ দেখা গেল না। এখন বড় হয়ে সে মুখখানা কেমন হয়েছে, অনেক চেষ্টা করেও মনে মনে তা গড়তে পারে না জয়গুন।

ছয়

১৫ই আগস্ট শুক্রবার, ১৯৪৭ সাল।

হাসু মা-কে মোড়লপাড়ায় নামিয়ে দিয়ে রেল-রাস্তার পাশে আসে। রোজ সেখানে কোষা ডুবিয়ে রেখে সে কাজে যায়।

রাস্তায় উঠেই সে চমকে ওঠে। চারদিক থেকে চীৎকারের ধ্বনি শোনা যায়। হিন্দু-মুসলমানে কাটাকাটি শুরু হল না ত!

রেল-রাস্তা ধরে সে ভয়ে ভয়ে পা ফেলে। মারামারি বাধলে কোন কাজই হবে না আজ। গত বছর এমন দিনে মারামারি বেধেছিল। পনেরো দিন সে ঘরের বার হতে পারেনি। তিনদিন না খেয়ে কাটাতে হয়েছে।

একটা গাড়ী আসছে নারায়ণগঞ্জ থেকে। ইঞ্জিনের সামনে একটা নিশান পত্‌পত্‌ করছে বাতাসে। সবুজ রঙের বড় নিশান। মাঝে চাঁদ ও তারা।

গাড়ীর মাঝেও চীৎকার। চারদিকের চীৎকারে আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে উঠেছে। গাড়ীটা কাছাকাছি আসতে স্পষ্ট বোঝা যায়—

আজাদ পাকিস্তান- জিন্দাবাদ!

কায়েদে আজম—জিন্দাবাদ!

হাসুর গা রোমাঞ্চিত হয় আনন্দে। সে চেয়ে থাকে। গাড়ীর প্রত্যেকটি লোক আনন্দ-চঞ্চল। অনেকের হাতেই নিশান। বাইরে মুখ বাড়িয়ে নিশান নেড়ে তারা চীৎকার করছে। প্রত্যেক কামরায় ঐ একই আওয়াজ।

হাসু হাত উঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে আওয়াজ তোলে ঐ সাথে।

মানুষের বিরাট মিছিল চলছে শহরের রাস্তা দিয়ে। হিন্দু-মুসলমান ছেলে বুড়ো—সবাই আছে মিছিলে।

হাসু দাঁড়িয়ে দেখছিল। মিছিল সে বহু দেখেছে। কিন্তু এ রকম আর দেখেনি। একজন কাগজের একটা নিশান ওর হাতে দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় লাইনে। হাসু মিছিলের সাথে মিশে যায়। কাজের কথা তার মনেই হয় না।

মিছিল শহরের সমস্ত রাস্তা ঘোরে। চীৎকার করে জানায় স্বাধীনতার বার্তা।

মিছিল ভাঙে দেড়টায়। হাসু তাড়াতাড়ি স্টেশনে আসে। মেল স্টীমার এখনও আসেনি। হাসুর ভাগ্য ভালো। আর দিন আসে একটার মধ্যেই।

তিনটার সময় মেল আসে। জাহাজের সামনে ঠিক ছাদের ওপর উড়ছে সবুজ নিশান। জাহাজের ডেকে লোক ঠাসাঠাসি হয়ে আছে। ছাদেও উঠেছে অনেক লোক, সেখান থেকে আওয়াজ ওঠে --

পাকিস্তান জিন্দাবাদ!

কায়েদে আজম—জিন্দাবাদ!

পাড়ের থেকে একদল তাদের ধ্বনির পতিধ্বনি করে। জাহাজখানা যেন কেঁপে ওঠে। সমস্ত মিলে একটা নতুন অনুভূতির সঞ্চার হয় হাসুর মনে।

দুটো মোট বয়ে আজ দশ আনা পায় হাসু। অন্য দিন দর কষাকষি হয়। তিন আনা বড় জোর চার আনার বেশী মোট পিছু দিতে চায় না। কিন্তু আজ আর পয়সার দিকে যেন খেয়াল নেই কারো।

আজ আর কাজ করবে না হাসু।

পথে আসতে আসতে সে দেখে, শহরের প্রত্যেক বাড়ীতে নিশান উড়ছে বড় বড়। সে তার হাতের কাগজের নিশানটার দিকে চায়, আবার চায় দুই পাশে। ডানে হিন্দু পাড়া, বাঁয়ে মুসলমান পাড়া। সব বাড়ীতেই আজ সবুজ নিশান।

হাসু বাড়ী আসে। চীৎকার করে সে গলা ভেঙেছে আজ। ভাঙা গলায় সে সমস্ত দিনের কথা বলে যায় মা-র কাছে। জয়গুন হাসুর হাত থেকে নিশানটা নিয়ে দেখে আর শুনে যায় হাসুর কথা এক মনে।

হাসু বলে—আর আমাগ কষ্ট অইব না, কেমুন গো. মা? মাইন্‌ষে কওয়াকওয়ি করতে আছে ঘাডে পথে। দ্যাশ স্বাধীন অইল। এইবার চাউল হস্তা অইব। মানুষের আর দুক্‌খ থাকব না।

- হুঁ। জয়গুন সায় দেয়। সে-ও সেদিন গাড়ীতে শুনেছে, দেশ স্বাধীন হবে। ভাত-কাপড় সস্তা হবে। কেউ না খেয়ে মরবে না।

জয়গুনের সুখের স্বপ্ন আজ সফল হল। সত্যি সত্যি স্বাধীনতা এল আজ।

হাসু বলে—টাউনে আইজ বেবাক বাড়ীতে নিশান ওড়তে আছে, মা। কি সোন্দর বড় বড় নিশান! তুমি একটা বানাইয়া দ্যাও, মা।

জয়গুন হাতের নিশানটা দেখিয়ে বলে এই যে আছে একটা। আর দিয়া কি অইব?

—এইডা যে এক্কেরেই ছোড। গাছের ডাইলে বাইন্দা উপরে তুলতাম, মা। গেরামের বেবাক মইন্‌ষে দ্যাখতে পাইব। টাউনে কত বড় বড় নিশান ওড়তে আছে আইজ!

জয়গুন ঘরে যায়। একটা গাঁট্‌রি নামায় মাচার ওপর থেকে। লাল কাপড়ের একটা টুকরো বের করে হাসুকে দেখায়।

উহুঁ, রাঙ্গায় অইব না, মা। এই রহম কচুয়া অওয়ন চাই। হাতের নিশানটা দেখিয়ে প্রতিবাদ করে হাসু।

ক্যা? রাঙ্গায় দোষ কি? কী সোন্দর খুনী রঙ! মীরপুরের শাহ সা'বের দরগায় দেইক্যা আইলাম লাল নিশান।

—টাউনের এক বাড়ীতেও রাঙ্গা নিশান ছাখলাম না। বেবাক এই রহম কচুয়া।

আসমানী রঙ্গে অইব?

—উহুঁ, কইলাম যে এই রঙ।

তোর লাইগ্যা এই রঙ বানাইলে পারি অহনে। জয়গুন রাগ করে। সে আর একটা গাঁট্‌রির জন্যে উঠতেই হাসু খুশী হয়।

গাঁট্‌রি খোলে জয়গুন। পুরাতন কাপড়ের গাঁট্‌রি। কালি ঝুলি মেখে বিশ্রী হয়ে গেছে গাঁট্‌রিটা। খুলতে খুলতে তার হাত অবশ হয়ে আসে। বুকের ভেতর স্পন্দন বেড়ে যায় অসম্ভব রকম। জীর্ণ পুরাতন কাপড় ভাঁজ করে সাজানো। জয়গুনের বিগত জীবনের অনেক কাহিনী কাপড়গুলোর মধ্যে পুঞ্জীভূত। ভাঁজ খুলতে খুলতে তার স্মৃতির ভাঁজও খুলে যায়। এই টুপিটা তার প্রথম স্বামীর—হাসুর বাপের। ঢোলা পাঞ্জাবীটাও তার। জয়গুনের চোখে ভাসে, কিশতি টুপি মাথায় পাঞ্জাবী গায়ে জব্বর মুন্‌শীর চেহারাখানা। …এই বোম্বাই শাড়ীটা তার প্রথম বিয়ের। ঘোমটা-টানা বধূ জীবনের সুমধুর স্মৃতি এখন শুধু ব্যথা-ই দেয়। এই ছোট্ট জামাটা কাসুর। এই জামা আর কানটুপিটা ছোট খুকীর।

জয়গুনের চোখ আর বাঁধ মানে না। চোখের পানিতে গাঁট্‌রির কাপড়-গুলো ভিজে ওঠে।

ছোট খুকী!

তখন দুর্ভিক্ষ সবে দেখা দিয়েছে। দুর্নামের ভয়ে স্বামী পরিত্যক্তা জয়গুন তখনও ঘরের বার হয়নি। খেতে না পাওয়ায় তার বুকে দুধ ছিল না। দুধের শিশু দুধ না পেয়ে শুক্‌নো পাটখড়ির মত হয়েছিল। শেষে ধুঁকতে ধুঁকতে একদিন মারা গেল। তাকে কবর দিতে কাফনের কাপড় জোটেনি। এই বোম্বাই শাড়ীটার অর্ধেক দিয়ে কাফন পরিয়ে যখন কবরে নামানো হয় তখন জয়গুন বিলাপ করতে করতে বলেছিল—"আইজ তোরে বউ সাজাইয়া দিলাম।"

জয়গুন আর ভাবতে পারে না। একমাত্র সবুজ বোম্বাই শাড়ীটার অবশিষ্ট পাট্‌টা হাসুর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সে কাপড়গুলোর মধ্যে মুখ লুকায়।

হাসু ও মায়মুন অবাক হয়ে চেয়েছিল মা-র দিকে। তারা কিছু বুঝতে না পেরে শাড়ীর পাট্টা নিয়ে বেরিয়ে যায়।

মায়মুন সুঁই নিয়ে আসে। সাদা কাপড়ের চাঁদ ও তারা কেটে নিশানের মাঝে জুড়ে দেয়।

বেশ সুন্দর নিশান হয়েছে। ঠিক সায়েব বাড়ীর নিশানটার মত। মায়মুন উৎফুল্ল হয়। হাসুর চোখে-মুখে হাসি ফোটে।

জয়গুন যখন বাইরে আসে, তখন হাসু আম গাছে উঠে নিশানটা বেঁধে দিয়েছে। মায়মুন ও শফী চেয়ে আছে ওপর দিকে। গাছের থেকে হাসু ডাকে—মায়মুন! শফী! আমি যা কই আমার লগে লগে আওয়াজ করবি, কেমুন?

শফী বলে—কি কইমু?

—পাকিস্তান—জিন্দাবাদ!

হাসুর সাথে গলা মিলিয়ে শফী ও মায়মুন আওয়াজ তোলে। জয়গুনের মনে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে কথাগুলো।

জয়গুন নিশানটার দিকে তাকায়। সবুজ নিশান নতুন জীবনের আভাস দিয়ে যায়। মনে জাগে বাঁচবার আশা।

সাত

চারদিকে আনন্দকোলাহল। মায়মুন ডাকে—মা, চান ওঠছে বুঝিন, ঈদের চান।

মায়মুন দৌড়ে যায় বাড়ীর পশ্চিম দিকে। শফী এসে দাঁড়ায় ওর পাশে। পশ্চিম দিগন্তের রঙীন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ওরা তন্ন তন্ন করে খোঁজে চাঁদ। জয়গুন এসে যোগ দেয়।

মায়মুন বলে—কই মা?

—অই সাঁঝুয়া তারাডার কাছ দিয়া ছাখ। ওডার নিচে দিয়াই ছাহা যায় হগল বচ্ছর।

—অই, ঐ যে ছাহা গেছে, ঐ-ঐ-ঐ! শফী লাফিয়ে ওঠে আনন্দে, মায়মুনকে টেনে আঙুল দিয়ে দেখায়—ঐ যে তারাডার একটু নিচে। কালা মেঘডার পাশে।

মায়মুন দেখতে পেয়ে আনন্দে হাত তালি দেয়। জয়গুন এখনও দেখতে পায়নি। সে বলে—আমাগ কি হেই দিন আছে! তোগ নতুন চউখ। তোরা ছাখতে পাবি।

—তুমি অহনও ত্থাহ নাই মা! মায়মুন এবার মা-কে দেখাতে চেষ্টা করে। জয়গুন দেখতে পায় অনেক পরে। ভক্তিতে সে মাথা নোয়ায়, দু'হাত তুলে মোনাজাত পড়ে।

—এক্কেরে কাচির মতন চিক্কন এইবারের চান। সিদা অইয়া ওঠ্‌ছে। আর হগল বচ্ছরের মতন কাইত অইয়া ওডে নাই। মোনাজাত সেরে বলে জয়গুন।

চাঁদটা মেঘের আড়ালে চলে গেলে জয়গুন আবার বলে—চল, ইফতার খুলি গিয়া।

শফীর মা-র ঘরের কাছে যেতে সে ডাকে—চান দেখলিনি, হাস্থর মা?

—হ বইন। ত্থাখলাম। বড ছোড এইবারের চান।

তোরাই ত্থাখ বইন, তোগ চইখ দিছে খোদায়। আমার একটা চইখ, হেইডাও বুঝিন্ বুইজ্যা গেল।

শফীর মা নিশ্বাস ছাড়ে। এমনি-ই সে লবেজান। তার ওপর রোজা রেখে সে বিকেলের দিকে খুবই কাহিল হয়ে যায়। সে আবার বলে—চাইর পাঁচদিন পরে ছাড়া আমি ত্থাকতে পারমু না। চানডা সিয়ানা অউক। আ-গো হাস্থর মা,—এইবার কোন্ মুহী কাইত অইয়া ওঠ্‌ছে গো চানডা? দহিণ মুহী?

—এইবারে সোজাসুজিই ওঠ্‌ছে বইন। ব্যাঁকা-ত্যাড়া ওডে নাই। লক্ষণ ভালা, না?

—হ বইন, আর আহাল অইব না এইবার দেহিস। যা কইলাম যদি না ফলে, তহন কইস, কানা বুড়ী কি কইছিল।

শফীর মা-র কুঁচকে যাওয়া শুক্‌নো কালো মুখখানা খুশীতে ভরে ওঠে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে সে মুখখানা দেখে জয়গুনেরও ভরসা হয়। ভবিষ্যদ্বাণীর মতই বিশ্বাস করে শফীর মা-র কথাগুলো।

শফীর মা বলে—হেই বচ্ছর পঞ্চাশ সনে দক্ষিণ মুহী কাইত অইয়া ঈদের চান উঠছিল। আমি নিজে দেক্‌ছি। চউখ তহন তাজা আছিল্। আমি দেইক্যা কইছিলাম তহন—এইবার না জানি কি আছে কপালে!

—দক্ষিণ মুহী কাইত অইয়া ওঠ্‌লে আকাল অইবই। বুড়া-বুড়ীর কাছে হুনছি, দক্ষিণ মুহী কাইত অইয়া চান যদি সমুদ্দুরের উপরে নজর দেয়, তয় বান ডাইক্যা ত্থাশ-দুইন্নাই তলাইয়া যায়। দেখলি না অ-ই বচ্ছর কেমুন—

—কত বছর পর এইবার সিদা ওঠ্‌ছে চান। খোদা বাঁচানেওয়ালা।

এফতারের সময় উৎরে গেছে। জয়গুন ঘরের দিকে পা দেয়। মায়মুন বলে—উত্তর মুহী কাইত অইয়া ওঠ্‌লে কি অয়, মা?

—মড়ক লাগে। কলেরা-বসন্ত অয়। মানুষ মইর‍্যা সাফ অইয়া যায়।

মায়মুন শিউরে ওঠে।

ওজু করে জয়গুন ঘরে যায়। শেষ রোজার ইফতারের জন্য আজ একটু আলাদা আয়োজন—চার ফালি শশা ও এক খোরা গুড়ের শরবত। আর সব দিন এক মগ সাদা পানি সামনে করে সে বসে থাকত বেলা ডুবে যাওয়া পর্যন্ত! এমন করে খাবার সামনে নিয়ে এফতারের জন্যে বসে থাকা অনেক পুণ্যের কাজ, সে জানে। মসজিদের আজান এফতারের সংকেত জানালে সে এক ঢোক পানি খেয়ে রোজা ভাঙত।

জয়গুন একচুমুক শরবত খেয়ে মায়মুনের সামনে ঠেলে দেয় বাটিটা। মায়মুন বাটিটা নিয়ে চুমুক দিতেই জয়গুন বলে—মজা পাইয়া বেবাকহানি খাইয়া ফেলাইস না আবার। তোর মিয়াভাইর লাইগ্যা থুইয়া দিস।

শশার এক ফালি মায়মুনের হাতে দিয়ে জয়গুন এক ফালি তুলে নেয়। বাকী দুই ফালি রেখে দেয় হাসুর জন্যে!

শশা চিবোতে চিবোতে সে গত কয়েক বছরের কথা মনে করে। পঞ্চাশ সনের পর থেকে সে এ রকম পুরো তিরিশ রোজা রাখতে পারেনি। চার বছর পর এবার তিরিশ রোজা পুরিয়ে তার মনে শান্তির অবধি নেই। কিন্তু গত বছরগুলির চিন্তাও তাকে পেয়ে বসে। পঞ্চাশ সনে একটা রোজাও রাখা হয়নি। তার পরের বছর ছয়টা, তার পরের বছর পাঁচটা এবং গত বছর সাতটা রোজা ভাঙা হয়েছে—সে মনে করে রেখেছে! জয়গুন হিসেব করে দেখে, এ কয় বছরে সে দু'কুড়ি আটটা রোজা ভেঙেছে। নামাজ-রোজা সম্বন্ধে অনেক খুঁটিনাটি তার জানা। প্রথম স্বামী জব্বর মুন্‌শীর দৌলতেই তা সম্ভব হয়েছে। সে জানে, রমজানের একটা রোজা ভাঙলে তার বদলে তিনকুড়ি রোজা রাখতে হয়, তবেই গোনা মাফ হয়।

জয়গুন হিসেব করতে চেষ্টা করে। আগেও সে করেছে কয়েকবার। একটা রোজার জন্য ষাটটা হলে দু'কুড়ি আটটার জন্য কতদিন রোজা রাখতে হয়। সে হিসেব করতে গিয়ে মাথা গুলিয়ে ফেলে। একশো পর্যন্ত সে ভালোমত গুণতে পারে না। 'এককুড়ি' 'দুই কুড়ি' করে সে হিসেব করে। সুতরাং সে ক্ষান্ত হয়। কিন্তু তবুও সে আন্দাজ করে নিয়েছে—অনেক বছর, হয়ত বা বাকী জীবনভর রোজা রেখেও সে আটচল্লিশ দিনের রোজা শোধ করতে পারবে না। সে আরো জানে, একটা রোজার জন্যে আশী হোক্‌বা দোজখের আগুনে পুড়তে হবে। এক একটা হোক্‌বা ইহকালের আশী বছরের সমান।

জয়গুনের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। সে নামাজ সেরে তসবীহ নিয়ে বসে। তসবীহ জপা এক সময়ে বন্ধ হয়ে যায়। তার আবার মনে হয়, কেন? সে-ত জীবনভর রোজা রেখেই চলেছে। রোজা ছাড়া আর কি? বারো মাসের একদিনও সে পেট ভরে খেতে পায় না। ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত আধপেটা খেয়ে

থাকে। পেট ভরে কবে সে শুধু দুটো ভাত খেয়েছে তার মনে পড়ে না। পঞ্চাশ সনের কথা মনে হয়। একটা রোজাও রাখা হয়নি। রোজা রাখার কথা মনেও হয়নি। এক বাটি ফেনের জন্যে ছেলেমেয়ে নিয়ে কত জায়গায়, কত বাড়ীতে বাড়ীতে তাকে ঘুরতে হয়েছে। এক বাটি খিচুড়ির জন্যে লঙ্গরখানায় লাইন ধরতে হয়েছে। কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা আধ-হাটু কাঁদার মধ্যে লাইনে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়েছে। মাথার ওপর বৃষ্টি পড়েছে, রোদ জ্বলেছে। তার বেশী জ্বলেছে পেটের মধ্যে। যখন যেখানে যতটুকু পেয়েছে, খেয়েছে। পেট ভরেনি। পানি খেয়ে খেয়ে পেট ভরেছে। তার পরের বছরগুলিও চলেছে অতি কষ্টে। ছেলেমেয়েকে খাইয়ে কতদিন উপোস করতে হয়েছে। মাঝে মাঝে সারারাত সারাদিন কেটেছে একটা দানাও পড়েনি পেটে। রমজান মাসের রোজার চেয়েও যে ভয়ঙ্কর এ রোজা। রমজানের একমাস দিনের বেলা শুধু উপোস। কিন্তু তার বারোমেসে রোজার যে অন্ত নেই।

কিন্তু তবুও জয়গুনের শান্তি নেই, সান্ত্বনা সে পায় না। তার অন্যায়ের জন্যে সে খোদার কাছে প্রার্থনা করে।

হাসু আসে রাত আটটায়। মোট বয়ে বারো আনা পেয়ে সে চার আনা দিয়ে একটা নারকেল নিয়ে আসে। জয়গুন দেখে রাগ করে—তোর আর আক্কল অইব কোনদিন। অত পয়সার নাইকল কিন্‌তে গেলি ক্যান?

—ঈদের দিন এট্টু শিন্নিও খাইমু না?

—নাইকল বেগর আর শিন্নি অয় না। নোয়াবের পো নোয়াব। নাইকল বেগরই পাকাইমু আমি। অইডা বেইচ্যা ফালাবি কাইল।

হাসু ক্ষুণ্ণ হয়। বলে—থাউক আর শিন্নি রানতে অইব না, পান্তা ভাত আর মরিচ-পোড়া খাওয়া কপাল। বচ্ছরের একটা দিন আর শিন্নি খাইয়া কি অইব!

জয়গুন চুপ করে। খানিক পরে আবার বলে পরাণে খাইতে চায়, খাও। পয়সা কামাই করবা, খাইবা, আমার কি? দুই দিন বাদে যহন হুকাইয়া তেজপাতা হইয়া যাইবা, তহন বোঝবা শিন্নির মজা!

খাওবার পর জয়গুন বাঁশের চোঙাটা নামায়। পয়সা রাখবার একমাত্র আধার এ চোঙাটা। মাটির ওপর ঢালে সমস্ত পয়সা। আনি, দুয়ানি, সিকি, আলাদা আলাদা সাজিয়ে হিসেব করে। হাসুর আজকের আট আনাসহ মোট তিন টাকা দশ আনা। চাল কিনতে হবে। তেল, মরিচ, আরো অনেক কিছুই নেই। অনেক কিছুর মধ্যে লবণটা না কিনলেই চলে না। লবণ একটু লাগে তার সংসারে। পান্তা ভাত খেতেই বেশী খরচ হয় লবণ!

হাসু বলে—একটা টুপি কিনার পয়সা দিবা, মা? কাইল ঈদের ময়দানে কি মাথায় দিয়া যাইমু?

তোর টুপি কিনন লাগত না। টুপি একটা দিমু তোরে, তয় কাসুর লাইগ্যা একটা টুপি—

হাসু সম্মতি-সূচক মাথা নেড়ে বলে—ওর একটা টুপি কিনতে আর কত লাগব ? ওই বড় জোর পাঁচ আনা, ছয় আনা।

মায়মুন একটু এগিয়ে মা-র দিকে চেয়ে ডাকে—মা

—কি ? থাইম্যা গেলি ক্যান ? ক'।

পরিহিত কাপড়ের একটা ছেঁড়া জায়গা দেখিয়ে মায়মুন বলে—ত্যাহ মা, কেমুন ছিড়্যা গ্যাছে। ঈদের দিনে বেড়াইতে যাইমু না ?

মেয়ের আবদার বুঝে রাগ হয় জয়গুনের। সে বলে—কি ? কাপোড় ?

—হ।

—হ! কাপোড়! কাপোড় দিয়া কবর দিমু তোরে শয়তান। ধাক্কা দিয়ে মায়মুনকে সরিয়ে ভেঙচিয়ে ওঠে জয়গুন।

হাসু মায়মুনের দিকে তাকায়। ব্যথায় তার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে।

মায়মুন তাড়া খেয়ে শুয়ে পড়েছে। জয়গুন ডাকে—হাসুর গামছাটা পিন্দা কাপোড় খুইল্যা দে মায়মুন, সিলাইয়া দেই। কাইল রাইত পোয়াইলে সোডা দিয়া ধুইয়া দিমুহনে।

জয়গুন সুঁই-সুতা নিয়ে বসে। নিজের ও মাইমুনের কাপড়ে জোড়াতালি লাগায়।

হাসু ও মায়মুন ঘুমিয়ে পড়েছে। মশার যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে নড়ে ওঠে। জয়গুন ওদের মুখে হাত বাড়িয়ে মশা তাড়ায়।

সেলাই সারতে অনেক রাত হয়। রাত্রির নীরবতা ভেঙে হঠাৎ ডাহুক 'কোয়াক কোয়াক' করে ওঠে। চারদিকে পশু-পাখীর ঘুমকাতর সাড়া পাওয়া যায়। ঘরের হাঁস দুটোও প্যাঁক প্যাঁক করে আবার ঠোঁট লুকায় পালকের মধ্যে। জয়গুন ভাবে---পইথ পাখলার এক ঘুম হয়ে গেল।

জয়গুন কুপিটা নিভিয়ে মায়মুনের পাশ দিয়ে শুয়ে তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে। অভ্যাস বসে মায়মুনও মা-র গলার উপর একখানা হাত লতিয়ে দেয় ঘুমের ঘোরে। জয়গুনের বুক স্নেহে ভিজে ওঠে। সে ভাবে এ মেয়েটি কোন দিন তার কাছে আদর পায় না। আবদার করলে কিল-থাপ্পড় খায়। কাপড় তার একখানা। তাও তালি দিয়ে দিয়ে এতদিন চলেছে। কিন্তু কাল ঈদ—বছরের সেরা দিন। এ কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করা চলে, কিন্তু কুটুম্ব-বাড়ী যাওয়া চলে না। আর কুটুম্ব আছেই বা কে ? হাসুব চাচা আছে দু'জন। কিন্তু তারা হাসুর মৃত্যু-ই কামনা করে। জব্বর মুন্সীর মৃত্যুর পর তার ভাগের তিন বিঘা জমি আর ঘরখানা পর্যন্ত হাসুর চাচা দু'জন জোর

করে ভোগ দখল করছে। এগুলোর আশা জয়গুন ছেড়েই দিয়েছে। হাসু বড় হয়ে যদি কোনদিন আদায় করতে পারে।

জয়গুন আবার ভাবে— হাসু ও মায়মুনের কপালে কুটুম্ব-বাড়ীর এক মুঠো ভাত লেখা নেই।

জয়গুন মায়মুনের চুলের মাঝে হাত দেয়। আঙুলের সাথে জড়িয়ে আসে এক গোছা চুল।

মায়মুন কোন কিছুর আবদার করলে বা কোন অন্যায় করলে সে চুল ধরে টান মারত। টানতে টানতে সে-ই আলগা করে দিয়েছে চুলগুলো। চুলগুলোর জন্য তার মায়া হয়। চুলের মুঠি ধরে টানাটানি না করলে, তার চুল এতদিন হয়ত কোমর অবধি লম্বা হত।

জয়গুন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, মায়মুনকে আর সে মার-ধর করবে না। অন্তত তার চুল ধরে আর সে টানাটানি করবে না। মেয়ে ব'লে মায়মুনকে এতদিন সে অনাদর করেই আসছে। কিন্তু আর না। হাসু কোলের আর মায়মুন পিঠের—তাত নয়! দু'জনকেই সে পেটে ধরেছে। আর মেয়ে হলেও মায়মুন লক্ষ্মী। সে বাইরে গেলে মায়মুনই সব কাজ করে। গায়ে এতটুকু জোর না থাকলেও কোন কাজ সে বড় ফেলে রাখে না।

মায়মুনের জন্যে আর কোন দিন জয়গুন এমন করে ভাবেনি। আজ হাসু ও মায়মুন তার চোখে সমান হয়ে গেছে।

অল্প কয়েকটা মাত্র চুল মায়মুনের মাথায়। বাঁদরের লোমের মত লাল। যত্ন ও তেলের অভাবে জট পাকিয়ে গেছে। জয়গুন অন্ধকারে মাথা হাতড়ে উকুন মারে। উকুনে গিজগিজ করছে মাথা। রাত্রে রাত্রে এমনি করে মেরে সে কমিয়ে রেখেছে। নয়ত উকুনের আণ্ডা-বাচ্চায় এতদিন মাথা ছেয়ে যেত। তার নিজের মাথায় উকুন টিকতে পারে না। নানা চিন্তা ভাবনায় মাথা গরম থাকে বলেই বোধ হয়।

অনেক রাত হয়েছে। উকুন বাছতে বাছতে মায়মুনের মাথায় হাত রেখেই জয়গুন এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

আট

খুরশীদ মোল্লা গ্রামের ফুড কমিটির সেক্রেটারী। ঈদের দিন ভোর হওয়ার সাথে সাথে তার বৈঠকখানার বাইরে জড় হয় অনেক লোক। কেউ কেউ ভেতরেও আসে।

খুরশীদ মোল্লা একটু দেরীতেই ঘুম ভেঙে তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে চৌকির

ওপর এসে বসে। তার মুখে বিরক্তির স্পষ্ট আভাস সবার চোখেই ধরা পড়ে। গ্রামের মোড়ল কাজী খলিল বক্শ ও গদু প্রধান চৌকির ওপর সেক্রেটারীর পাশে বসে পড়ে।

খুরশীদ বলে—দেখুন তো কি ঝন্‌ঝাট। ভোর না হ'তেই বাড়ী মাথায় করে তুলেছে সব। ঈদের দিন এই উৎপাত কার ভাল লাগে? চিনি এসেছে মাত্র ক'মণ, আর গ্রামে লোক হচ্ছে দু'হাজার! এক তোলা করেও পড়বে না মাথা পিছু।

কাজী খলিল বক্শ উপস্থিত একজনকে উদ্দেশ্য করে বলে—কিরে লেদু, চিনি দিয়া কি করবি? তারপর নিজে নিজেই বলে—ভাত জোটে না, চিনি খায়। বাহার ব্যাটা! হেই-যে মাইনষে কইছিল—ঘর নাই, দুয়ার দিয়া হোয়।

লেদু মিয়া টিপ্পনী কাটতে পটু। ভেতরে ভেতরে গরম হয়ে বলে—আমাগ মতন গরীব মাইনষের আবার ঈদ কি? ঈদ অইল আপনেগ লইগ্যা, বড়মিয়া সাব। হ্যা—হ্যা—হ্যা।

কাজী মোড়ল ভ্রূকুটি করে। আস্তে আস্তে সে সেক্রেটারীকে বলে—এ হারামজাদাকে এক কণা চিনিও দিতে পারব না, কইয়া রাখলাম।

গদু প্রধান এতক্ষণে কথা বলে—কি মোল্লার পো, চা অইব নি? তারপর নিজেই হাঁক দেয়—ওরে নসুয়া, চা দিয়া যা তুই কাপ।

রোজ ভোরে খুরশীদ মোল্লার বাড়ীতে তাগাদা দিয়ে চা খাওয়ার অভ্যাস তার। ভুলেও তার একদিন বাদ যায় না। রোজার মাসে মুখ বন্ধ ছিল বলে এক মাস মোল্লা গদু প্রধানের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল। মুখ খোলার সাথে সাথেই তার আগমনে খুরশীদ মোল্লা বিরক্ত হয়। সে খলিল বক্শের দিকে চেয়ে বলে—আপনি খাবেন না, কাজীর পো?

—হ, খাইমু। খাইমু না ক্যান? তুমি ত বা'জান চিনির রাজা।

খুরশীদ হাঁক দেয়—তিন কাপ—তিন কাপ ক'রো চা।

খলিল বক্শ বলে—আর যা ক'রো ক'রো—আমার ছয় সের চাই-অই। এইডুক না অইলেই অইব না। তুমি জ্ঞাত আছ, এক পাল পৈষ্যের সংসার আমার।

গদু প্রধান বলে—আমার পাঁচ সের আগে রাইক্যা, তারপর ভাগ কর। পাঁচ সের না পাইলে ফাডাফাডি আছে তোমার লগে।

—কাকে রেখে কাকে দেই? আচ্ছা, দেখা যাবে। এ পাঁয়তাড়া আর কদ্দিন ভালো লাগে, বলুন! বিনে পয়সার চাকরি! ইচ্ছে হয় ছেড়ে দিই এই মুহূর্তে।

—না না, ছাড়বা ক্যাঁ? তুমি না অইলে—

—ব্যাপার দেখুন না। এত খাটছি, তবু নাম নাই। সবাই বলে চোর।

—কোন্ শালা কয় ? দেইক্যা নেই তার গর্দানে কয়ডা মাথা।

চা আসে। তিনজন তিনটা বাটি নিয়ে চুমুক দেয়। জমিদারের পাইক এসে এক টুকরো কাগজ সামনে ধরে। খুরশীদ মোল্লা পড়ে একটু ব্যস্ত হয়ে বলে --ভবানী বাবু বাড়ী এসেছেন নাকি ? আর কে কে এসেছেন ?

—না, তিনি একলাই আইছেন ! দিন চাইরেক থাকবেন। চা খাওনের লাইগ্যা তাই—

আচ্ছা, আচ্ছা, তোমাকে বলতে হবে না আর। মাত্র পাঁচ সের ত ? তুমি যাও। আমি নিজেই দিয়ে আসব 'খন। এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমি আসব।

চা শেষ করে খুরশীদ মোল্লা দোয়াত কলম নিয়ে উবু হয়ে বসে। দুই টুকরো কাগজে দুটো পারমিট লিখে খলিল বক্শ ও গদু প্রধানের হাতে দিয়ে বলে—চার সের করে লিখে দিলাম আপনাদের। ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বারদের দিতে হবে আবার।

বাইরের লোক এতক্ষণে উতলা হয়ে গেছে। কেউ কেউ চলেও গেছে এর মধ্যে।

এবার খুরশীদ মোল্লা উঠে তাদের উদ্দেশ করে বলে—আমি কি করতে পারি, বল তোমরা। গভরমেণ্ট মোটে সাপ্লাই দেয় না, তার আর—হ্যাঁ শোন অল্প কিছু চিনি আছে হাতে। মাথাপিছু এক তোলা করেও পড়বে না। তার চেয়ে বরং এক কাজ করলে হয়, আবার যখন চিনি আসবে, তার সাথে মিলিয়ে ভাগ করে দেওয়া যাবে।

একজন আর একজনকে বলে—চল্ যাইগা। এই সব না দেওয়ার ছল-চক্কর। এইহানে হত্তা ধইরা থাক্লে জামাত্ পাওয়া যাইব না।

সব লোক সরতে আরম্ভ করে। খুরশীদ মোল্লা আবার বলে—কি করবে আর। গুড় কিনে নাও গে।

একজন বলে—গুড়ের সের ছাড় টাকা। আমরা কি অত পয়সার গুড় কিন্যা খাইতে পারি মিয়া সাব ? রেশনের চিনি অইলে তয়—

কথা শেষ না হতেই আর একজন বলে—আপনেরাই ঈদ করেন। আপনেগ দিন দিছে খোদায়—ঈদ করতে দিছে।

কথাগুলি কোন রকমে হজম ক'রে খুরশীদ মোল্লা অন্দরে যায়। এক্ষুণি জমিদার বাড়ী যাওয়া তার দরকার।

হাসু এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিল। সে এবার বাজারের পথ ধরে।

বাজারের একটা জায়গায় সারি সারি গুড়ের হাঁড়া ও জালা সাজিয়ে দোকানদাররা বসেছে। আজ এদিকে খুব ভিড়। মাছি-মৌমাছিও ভিড় করেছে গুড়ের ওপর। কয়েকটা ভিখারী ছেলে গুড় কেনার নামে এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত সমস্ত হাঁড়ার গুড় চেখে বেড়াচ্ছে। এক দোকানীর তাড়া

খেয়ে একটি আধ পাগলা ভিখারি ছেলে বলছে—অমন কর ক্যান ? ঈদের দিন এট্টু মিডা মুখ করি, মিয়া ভাই। হিঁ—হিঁ—হিঁ।

দোকানীরা খরিদ্দারের সাথে দর কষাকষি করে, গুড় মেপে দেয় আবার মাঝে মাঝে গামছা নেড়ে মাছি তাড়ায়।

হাসু একটা হাঁড়ি থেকে আঙুল দিয়ে একটু গুড় নিয়ে বলে—একটু কড়া জ্বালের। ছ্যাট্টাকা কইর‍্যা দিবানি ? হে অইলে দ্যাও এক পোয়া।

—উহুঁ। এক টাকা বারো আনার এক আধলাও কম না।

পেছন থেকে একজন হাসুকে টান দেয়। সে হাসুদের প্রতিবেশী কেরামত। সে বলে—মিডাই না কিন্যা চিনি লইয়া যা। এই দ্যাখ আমিও কিনলাম। দুই টাকা কইর‍্যা চিনি। মিডাইর তন ভালা বরকত দিব।

—কোন ঠায় ?

—লতিফ মোল্লার দোকানে। খুরশীদ মোল্লার ভাই লতিফ মোল্লা। পিছ-দুয়ার দিয়া যা চুপচাপ।

হাসু বলে—ওঃ ফুড কুমুডির চিনির এই দশা! হেই ত আমরা কই, চিনিগুলা কই যায় ?

—আর কইস না। ব্যালাক চালাইয়া ব্যাডা ফুইল্যা গেল।

হাসু একটু চিন্তা করে বলে—থাউকগা, মিডাই কিন্যা লইয়া যাই।

হাসু বাজার নিয়ে বাড়ী আসে।

খেতে বসে হাসু ও মায়মুন। খাওয়ার সময় সুড়ুত সুড়ুত শব্দ হয় ওদের মুখে।

হাসু বলে—শিন্নি পানসা অইয়া গেছে মা, মিডা হয় নাই এক্কেরেই।

জয়গুন বলে—যেমন গুড় তেমন মিডা। তিন পোয়া চাউলে এক পোয়া গুড়। মিডা অইব কেমনে ?

—নাইকল দেওনে তবু একটু সোয়াদ অইছে, না মা ?

—হ! আলা চাউল অইলে দেখতি কেমুন মজা অইত! সিদ্ধ চাউলে আর কি অইব ?

—আরেট্টু দ্যাও, মা।

—উঁহু, অহন আর না। ঈদগার তন আইয়া আবার খাবি।

—ঈদের দিনও এট্টু মনাচ্ছি মতন খাইমু না ?

—তোগই পেট আছে, অঁ্যা ? আর কেঅর নাই ? শফীডারে এট্টু দিয়া আইতে অইব। ওগ ঘরে যে কিচ্ছুই পাক অয় নাই।

হাসু এবার চুপ করে। মায়মুনের পাতেরটা শেষ হয়ে গেছে। সে আঙুল দিয়ে তখনও চাট্‌ছে থালাটা।

জয়গুন বলে—অহন আত ধো। তুই হ্যাথতে আছি বাসনডা ভাইঙ্গা খাইতে চাস।

মায়মুন লজ্জিত হয়। থালায় পানি ঢেলে সে হাত ধুয়ে উঠে পড়ে।

জয়গুন হাসুকে বলে—মাচার উপরতন কালা কাপড়ের গাট্টিডা নে। ওডার ভিতরে একটা টুপি আছে। ওডা তুই নে, আর নতুনডা কাসুরে দিয়া আয়।

—আমি পারতাম না মা। হাসু বলে।

ক্যাঁ ?

ঐ দিনের চরকি দিতে যাওয়ার বিপদের কথা হাসু মা-কে বলেনি। সে বলে—আমি ঈদগায় যাইমু, মা। নামাজের ওকত অইয়া গেছে। তুমি আর কেঅই রে দিয়া—

—আর কারে পাডাই ? তুই-ই যাওনের কালে এট্টু ঘুইর‍্যা ওইহান অইয়া দিয়া আয়।

হাসু আর গোপন রাখতে পারে না। শেষ পর্যন্ত সে বলেই ফেলে সেদিনের সব কথা।

জয়গুন অসহায়ের মত তাকায় ছেলের মুখের দিকে। শেষে বলে—আগে কস্ নাই ক্যাঁ ? এত পয়সার টুপিডা ফালাইয়া দিমু ? তোর মাতায়ও লাগব না।

—কানা মামানীরে দিয়া পাডাইয়া দ্যাও।

কথাটা জয়গুনের পছন্দ হয়। শফীর মা বুড়ো মানুষ। সে নিয়ে গেলে করিম বক্শ লজ্জায় কিছু বলবে না হয়ত। রাখতে পারে। তা' ছাড়া ঈদের দিন। খুশীর দিনে সে হয়ত রাগ করবে না।

হাসু গাঁটরি খোলে। বাপের কিশতি টুপিটা বের করে মাথায় দেয়। টুপিটা অনেক বড় হয়েছে। কান পর্যন্ত ডুবে যায় টুপির মধ্যে।

জয়গুন হাসুর দিকে এক নজর চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়। সে আর তাকাতে পারে না।

হাসু গামছাটা কাঁধে ফেলে কোষায় চড়ে। শফীর মা এবং শফীও ওঠে কোষায়। হাসুকে ঈদগা'র রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে শফীর মা শফীকে নিয়ে করিম বক্শের বাড়ীতে যাবে। এখন যাওয়াই ভালো। করিম বক্শ এখন বাড়ীতে নেই। নামাজ পড়তে গিয়েছে নিশ্চয়ই।

শফীর মা টুপিটা দিয়ে নিরাপদেই ফিরে আসে।

জয়গুন খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞেস করে কাসুর কথা।

—টুপিডা ঠিক অইল নি মাতায় ?

—হ, টুপিডা মাথায় দেওনে এমন সোন্দর দেহাইল কাসুরে! কি কইমু তোমারে— যেন একটা পরীর বাচ্চা!

শফীর মা আবার বলে—সময় বুইঝ্যা গেছিলাম গো। করিম বক্‌শ বাড়ীতে আছিল না। নামাজ পড়তে গেছিল। ওর বউরে তালিম দিয়া আইছি। টুপি যে তুমি দিছ, তা হে কইব না। হে কইব, হে-ই কিন্যা দিছে।

জয়গুন নিশ্চিন্ত হয়। তার ভয় ছিল করিম বক্‌শ হয়ত ছেলেটাকে মারতে শুরু করবে।

শফীর মা বলে—করিম বক্‌শের বউ মানুষ ভালা, খুব হাসিখুশী। আমারে পিঁড়ি দিল বসবার। নিজেই এই এত বড় একটা আস্ত ধলডোগ পান ছেঁইচ্যা দিল।

জয়গুন বলে—কাসু কিছু কইল ?

—উঁহু। ও আমার মোখের দিগে চাইয়া আছিল! এক্কেরে এতিমের মতন—যেন্ বাপ-মা নাই।

—তুমি কোলে নিলা না ?

—নিলাম ত। আমার কোলের তন আর কি নামতে চায়! এক্কেরে বুকের লগে মিশ্যা আছিল। তারপর কত কোস্তাকুস্তি কইর‍্যা কান্দাইয়া নামাইয়া থুইয়া আইলাম। কি জানি, করিম বক্‌শ আইলে আবার কি কাণ্ড কইর‍্যা ফালায়।

জয়গুন একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করবার চেষ্টা করে।

নয়

জয়গুন ও হাসু আজ সকাল সকালই বেরিয়ে গেছে।

মায়মুন হাঁস দুটো খাঁচা থেকে বের করে পানিতে ছেড়ে আসে। এবার সে হাঁসের বাচ্চা দুটো বের করে ঘরের মেঝের ওপর ছেড়ে দেয়। নিজেও হাত দুটো মাটিতে রেখে উপুড় হয়ে চেয়ে থাকে। হলুদ রঙের বাচ্চা দুটো কেমন সুন্দর হাঁটে আর চিঁপ-চিঁপ করে। মায়মুনের আনন্দ হয়।

কাল মায়মুন বাচ্চা দুটো নিয়ে এসেছে। সোনাচাচী বলে দিয়েছে—আমারে এক আলি আণ্ডা দিবি। আমারে না খাওয়াইলে পাতিহিয়ালে ধইর‍্যা লইয়া যাইব তোর আঁস, কইয়া রাখলাম।

মায়মুন স্বীকার ক'রে এসেছে। সোনাচাচীকে প্রথম দুই দিনের ডিম সে দেবে। তাকে আগে না খাইয়ে নিজেরা ছোঁবেও না ডিম।

কাল বাচ্চা দুটোকে নিয়ে আসার পর থেকে মায়মুন ওগুলোকে নিয়েই কাটিয়ে দেয়। কখনো মাটির ওপর ছেড়ে দেয়, আবার কখনো বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে। রাতে শুতে যাওয়ার সময়ও সে বাচ্চা দুটো কাছ ছাড়া করতে চায় না।

জয়গুন ধমক দিয়ে বলে—সুখে থাকতে ভূতে কিলায় ? খাঁচার নিচে রাইখ্যা আয় জলদি। না'লে চুল ছিঁড়্যা ফালাইমু টাইন্যা।

মায়ের ধমকের কাছে মায়মুন এতটুকু হয়ে যায়।

বাচ্চা দুটো খাঁচার নীচে রেখেই সে শুয়ে পড়ে। কিন্তু তার ঘুম আসে না। অনেক রাত পর্যন্ত সজাগ থেকে সে শুনতে পায় বাচ্চা দুটোর ডাক। মাঝে মাঝে চিঁপ্ চিঁপ্ করে ওঠে ওগুলো। শিশুর কান্নায় অসহায় মায়ের মত অবস্থা হয় মায়মুনের।

মা চলে যাওয়ার পর মায়মুনের পূর্ণ স্বাধীনতা। এবার তাকে বলবার কেউ নেই। বাচ্চা দুটোকে খাঁচার মধ্যে রেখে সে উঠানের দক্ষিণ পাশে লাউমাচার নিচে একটা জায়গা বেছে নেয়। কোদাল নিয়ে মাটি খুঁড়ে চৌকা একটা গর্ত করে। পানি ঢেলে সেটাকে ভরে। তারপর বাচ্চা দুটোকে ছেড়ে দেয় তার মধ্যে।

হাঁসের বাচ্চা দুটোর নতুন অভিজ্ঞতা। জন্মাবার পর এই প্রথম তারা পানির পরশ পায়। সেজন্যে পানিতে ছেড়ে দিতেই ভয় পেয়ে ওপরে ওঠে আসে। মায়মুন ভাবে—দুদিন গেলেই ঠিক হয়ে যাবে। বড় হাঁসের মতই সাঁতরাবে তখন।

মায়মুন গর্তটার চারদিকে কতকগুলো লম্বা পাটখড়ি পুঁতে দেয়। এমনি-ভাবে লাউমাচার সমান উঁচু করে সে একটা বেড়া বানিয়ে ফেলে। চিল বা বাজ ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে না পারে, সেজন্যে এ সতর্কতা।

মায়মুন বাড়ীর চারপাশ ঘুরে ছোট বড় নানারকমের শামুক কুড়িয়ে আনে। দা দিয়ে সেগুলোর খোসা ছাড়ায়। তারপর কুচি কুচি করে কাটতে কাটতে গান গায়—

শামুক খাজারে, আমার বাড়ী আয়,
কুচি কুচি শামুক দিমু, হলদি দিমু গায়,
ওরে শামুক খাজারে।
তোর বাড়ী অনেক দূরে, সাত পাক ঘুইরে ঘুইরে
আমার বাড়ী আয়।

শফী এসে পাশে দাঁড়ালে মায়মুনের গান বন্ধ হয়ে যায়।

শফী বলে—এগুলা দিয়া কি করবি ?

মায়মুন কিছু না বলে হাঁসের বাচ্চা দুটো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

—দে আমি কাইট্যা দেই।

—উঁহু আমি পারি কত কাটতে।

মায়মুন একটা পাতায় করে কুঁচিকুঁচি করে কাটা শামুক নিয়েবাচ্চা দুটোর সামনে ধরে। বাচ্চা দুটো কয়েকবার ঠোঁট দিয়ে নেড়ে খেতে শুরু করে।

শফী বলে—বাহ্ খাইতে শিখ্ছে রে! কেমন ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ কইরা খায়! ছ্যাখ্ চাইয়া।

--দেখছি।

মায়মুন বসে বসে দেখে।

শফী বলে—আমারে একটা বাচ্চা দিবি?

—ইশ্!

—পয়সা দিমু আষ্ট খান।

—উঁহু এক ট্যাহা দিলেও না।

—ফুলঝুরি দিমু। আর চুলের কিলিপ।

মায়মুন বলে উঁহু, সাত রাজার ধন মাণিক্য দিলেও না।

—না দিলে চুরি কইর‍্যা লইয়া যাইমু তোর আঁস, কইয়া রাখলাম।

মায়মুন এবার চেঁচিয়ে ওঠে—মামানী, ও মামানী, ছ্যাখ তোমার পোলা কেমুন লাগাইছে। তারপর হাঁসের বাচ্চা রাখবার গর্ত থেকে পানি ছিঁটিয়ে দেয় শফীর চোখেমুখে।

শফীর মা-ও শফীকে ডাক দেয়—অ্যারে শফী, কি শুরু করলি? আমি আইলে ঠ্যাঙ ভাঙুম কিন্তু!

—না মা, ফাঁকিজুকি দিলাম আমি।

কলাগাছের ভেলায় চড়ে শফী ও মায়মুন মোড়লদের ছাড়া ভিটেয় যায় লাকড়ি কুড়াতে। শফী জঙ্গলের ভেতর দিকে নিয়ে যায় মায়মুনকে। শফী গাছে উঠে শুক্‌নো ডাল ভেঙে নিচে ফেলে। মায়মুন কুড়িয়ে জড়ো করে এক জায়গায়।

শফী গাছে চড়তে বেশ ওস্তাদ। এক গাছের ডাল বেয়ে সে আর এক গাছে চলে যায়। মায়মুন বলে আর ওই মুহী যাইও না শফী ভাই, ঐ গাবগাছে—

—কি ঐ গাবগাছে?

—আলেক মোড়লের বউ গলায় দড়ি দিছিল ঐ গাবগাছে, তুমি বুঝিন জান না?

—হেতে কি অইছে?

—উঁহু, আমার ডর করে। তুমি নাইম্যা আহ হবিরে।

শফী গাছ থেকে নেমে বলে—মায়মুন চাইয়া ছ্যাখ দেহি, ঐ দিক ঐ গাবগাছে কালা একটা কি ছ্যাহা যায়!

মায়মুন ঐ দিকে না চেয়েই ওগো মাগো বলে শফীকে জড়িয়ে ধরে। শফী জোরে হেসে ওঠে। বলে আরে কিছু না, ফাঁট্‌কি একদম ফাঁট্‌কি। দিনে-দুপৈরে কিয়ের ডর? চাইয়া ছ্যাখ্। ছ্যাখ্ না ছেঁড়ি। কিছুই না, চউখ মেল এইবার।

মায়মুন তবু চোখ খোলে না।

শফী ওকে কোলে তুলে ভেলার কাছে নামিয়ে দেয়। মায়মুন এতক্ষণে চোখ মেলে। সে বলে—তুমি কি ফাজিল। খামাখা ডর দেহাইলা।

শফী হাসে হিঁ-হিঁ করে।

মায়মুন বলে—তুমি গিয়া লাকড়ি লইয়া আহ। আমি আর যাইতে পারতাম না।

শফী বাগানে যায়। শুক্‌নো ডালগুলো একটা লতা দিয়ে বেঁধে মাথায় করে নিয়ে আসে। তারপর বাড়ী এসে দুটো ভাগ করে। নিজের ভাগের থেকে কয়েকটা ডাল মায়মুনকে দিয়ে বলে– তোরা মানুষ বেশী। এই কয়ডা বেশী নে তোরা।

বিকেল বেলায় মায়মুন তেঁতুল-তলায় বড়শী নিয়ে বসে। তার কোলের কাছে হাঁসের বাচ্চা দুটো। আবার শফী এসে জোটে সেখানে। একটা ঢিল ওর বড়শীর কাছে ছুঁড়ে শফী তেঁতুল গাছের আবডালে পালায়।

মায়মুন কিছু দেখতে না পেয়ে দাঁড়াতেই হেসে ওঠে শফী – হিঁ-হিঁ-হিঁ !

মায়মুন বলে—তুমি বড় শয়তান। চাইঙ্গা মারলা ক্যান ?

—কই চাইঙ্গা ! মাছে ডাফ দিল ছেঁড়ি। জবর মাছ অইবরে ! বোয়াল মাছ।

মায়মুন মাথা নেড়ে বলে--হুঁ বোয়াল মাছ !

—হ রে হ। কি মাছ পাইছস ?

– কিচ্ছুই না। একটা তিঁত্ পুডিও না।

—কিচ্ছুই না ?

—উঁহু।

শফী আশ্চর্য হয়। তারপর গম্ভীরভাবে বলে—তোর বড়শীতে ক্যার জানি মোখ লাগছে রে ! কেও নষ্ট না করলে এমুন অয় ? আমার মনে অয়, কেও ডিঙ্গাইয়া গেছে তোর ছিপ। হেই-এর লাইগ্যা মাছ ওঠতে আছে না।

মায়মুন শফীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

শফী বলে—পোড়াইয়া নে আগুনে। ঠিক অইয়া যাইব।

শফী ও মায়মুন মাটির হাতায় আগুন নিয়ে বড়শীটা পোড়া দেয়। তারপর একসঙ্গে সুর করে বলে—

বড়শী পুড়ি, বড়শী পুড়ি,
ট্যারা পড়শীর মোখ পুড়ি,
মাছ ধরমু দুই কুড়ি॥
লোয়ার বড়শী সূতার ডোর

পুঁডি পাবদা, শিং মাগুর ॥
বড়শী আমার প্যাদা
ধইর‍্যা আনব ভ্যাদা—
ভ্যাদা মাছে ক্যাদা খায়,
পুঁডি মাছে পান চাবায়।
অ—হো—হো হি—হি—হি—হি!

শফী ও মায়মুন দুজনে হেসে লুটোপুটি। শফী মাটি খুঁড়ে কেঁচো তুলে দেয়। মাছ কেঁচোর টোপ খায় ভাল।

মায়মুন আবার বডশী নিয়ে বসে।

সন্ধ্যার পর সে শফীর মা-র ঘরে যায়।

শফীর মা বলে—আমার পানডা ছেঁইচ্যা দেতো, ময়মন। তুই ভালা ছেঁচতে পারস। শফী পারে না। ও দিলে কোনদিন খ'র বেশী অয়, আবার কোনদিন চুনা বেশী পড়ে।

প্রশংসায় মায়মুন খুশী হয়। কলাপাতায় জড়ানো পান খুলতে খুলতে মায়মুন বলে—কতডুক্ নিমুগো, মামানী?

—আধ খান নে। তয় অডুকে গাল ভরে না। গাল না ভরলে কি পান খাইয়া সুখ আছে? কিন্তু কি করমু আর। গাছের পাতা, হেই-এর যে দাম! হোন্‌লে মাথা ঘোরে। দুইডা পান একটা পয়সা। আগে এক পয়সায় এক বিড়া পাওয়া যাইত।

মায়মুন ঠনর ঠনর করে পান ছেঁচতে আরম্ভ করে।

শফীর মা আবার বলে— আইজ-কাইল বেবাক জিনিসই আক্রা। আগে এক ট্যাকায় আধামণ চাউল মিল্‌ত। আমার বয়সেই দেখ্‌ছি। আর অহন বেবাক জিনিসের উপর তন খোদার রহমত উইট্টা গেছে। আগে এক ট্যাকার বাজার কিনলে এক মরদের এক পোঝা অইত। আর অহন এক ট্যাকার বাজার আতের তালুতে লইয়া বোম্বাই শহর যাওয়ন যায়!

শফীর মা বলেই চলে—তোর মামু একটা ইল্‌শা মাছ আন্‌ছিল দুই পয়সা দিয়া কিন্যা। তহন শফী অয় নাই। মফি আমার পেডে। এই এ-ত বড় মাছটা! হেইডার একজোড়া আণ্ডা যা অইছিল—এই এক বিঘৎ লম্ফা। তখন আমার বুক জুইড়্যা ওরা ভাই বইনে চাইর জন। কত খুশী অইছিল হেই আণ্ডা দেইখ্যা!

শফীর মা আর পুরাতন স্মৃতি ঘাঁটিতে সাহস পায় না। সে সব সময় ভুলে থাকতেই চেষ্টা করে। কিন্তু কথায় কথায় বা একা বসে থাকলে যখন সে স্মৃতি এসেই পড়ে, তখন সে আর তা সহ্য করতে পারে না। বিনিয়ে বিনিয়ে বিলাপ করতে শুরু করে। তার এই পঞ্চাশ বছর বয়সে সে নয় সন্তানের জননী।

কিন্তু একমাত্র শফীই বেঁচে আছে—বাকী আটটির চারটি আঁতুড়েই শেষ হয়। দুটি কলেরায় আর একটি বসন্তে মারা যায়। আর একটি—তাব নাম মফি, শফীর দুই বছরের বড় ছিল—দুর্ভিক্ষের বছর সে কোথায় হারিয়ে গেল। শফীর মা আজও এ ছেলেটির আশা ছাড়েনি। তার ধারণা মফি এখনও বেঁচে আছে।

মাঝে মাঝে শফীর মা দীর্ঘ-নিশ্বাস ছেড়ে বলে—আমার ওরা বাঁইচ্যা থাকলে এই দশা আমার? আইজ আমি খরাত কইর‍্যা খাই। ওরা বাঁইচ্যা থাকলে আমার বাদশাই কপাল আছিল। ওরা কামাই করত। ওগ বউ আইত ঘরে। ওরা রাইন্দা-বাইড়্যা সামনে ধরত। সোনার খাটে বইস্যা, রূপার খাটে পাও রাইখ্যা আমি সব ভাখতাম আর হুকুম করতাম। নাতি-নাতকুড় ঘিরা বইত চাইর পাশে। ক্যাঁচম্যাচ করত কিচ্ছা হোননের লেইগ্যা।

শফীর মা-র চোখ দিয়ে দরদর করে পানি গড়িয়ে পড়ে। মায়মুন দেখে আশ্চর্য হয় না। কারণ, এ আজ নতুন নয়। কখন সে কাঁদবে আর কখন কাঁদবে না—কেউ বল্‌তে পারে না। মায়মুন ছেঁচনীর থেকে ছেঁচা পান তুলে ধরে। শফীর মা মুখে দেয়।

মায়মুন এবার বলে—একখান কিচ্ছা কও না, মামানী?

—না লো। আইজ আর পরাণডা ভালা ঠেকে না।

মানমুন আর অনুরোধ করে না। শফীর মা বলে—তুই একটু দেইখ্যা আয়তো শফী কি দিয়া কি রান্‌দে। কয়ডা কলমীর শাক রানব আর ভাত। কাইল ভাত ফুটছিল কম। চাউল চাউল ভাত গিল্যা গিল্যা খাইছি। দাঁত-দন্ত না থাকা আর এক জ্বালা।

মায়মুন রান্না ঘরে যায়। চুলোর ওপর বসানো ভাতের হাঁড়ি থেকে কয়েকটা ভাত তুলতে তুলতে শফীকে বলে—একটা শোলক ভাঙ্গাও দেহি শফী ভাই--

মাছ করে ঝক ঝক ছোট্ট এক ঝিলে
একটা মাছে টিপ দিলে বেবাকগুলা মিলে॥

—ইশ্‌, জবর, শোলক ত! এইডা শিক্‌খা রাখছি কুট্টিকালে—ঝিল অইল আঁড়ি আর মাছ অইল ভাত! কেমুন? অইছে? এইবার একটা মাছে টিপ দিয়া ভাখ দেখি ফোট্‌লনি?

মায়মুন একটা ভাতে টিপ দিয়ে বলে—অইয়্যা গেছে। ভাখত কেমুন মজা! একটা ভাতে টিপ দিলে বুঝা যায় ফোট্‌লনি না ফোট্‌ল না।

—আর একটু ফোট্‌তে দে। মা আবার শক্ত ভাত খাইতে পারে না।

—কাইল তুমি শক্ত শক্ত চাউল চাউল ভাত রানছিলা, মামানী কইছে। ভাত রানতেও জান না?

—আমি জানি না, কে জানে রে? টিক্কাদার সা'বের বাসায় এতকাল পাক করলাম আমি। আইজ তুই আমারে হিগাইতে আইছস?

রান্না সেরে শফী ও মায়মুন ঘরে এলে শফীর মা বলে—তোর মা অহনো আইল না, ময়মন? রাইত যে অনেক অইল!

বাইরে চ্যাবর চ্যাবর পায়ের শব্দ শোনা যায়। উঠানে কাদার মধ্যে দিয়ে কে যেন আসছে।

শফীর মা ডাকে—হাসুর মা?

—হ ভা'জ, আমি অই।

—আহো আমার ঘরে।

জয়গুন এসে দরজায় দাঁড়ায়। শফীর মা বলে—তোর হায়াত আছে। অনেক দিন বাঁচবি তুই। এই এট্‌টু আগেই তোর নাম নিছিলাম।

অহন যাই বইন। আখা ধরাইতে অইব আবার।

—আইচ্ছা যাও। আখা ধরাইয়া এট্‌টু এদিকে আইও, তোমার লগে কতা আছে।

—কি কতা?

—পরে কইমু। অহন যাও। চাউল কি দর আনলাগো?

—দুই সের, বইন। দর চইড়্যা গেছে। আর যা মছিবত আইজকাইল। ট্যারেনে যা মানুষের ভিড়। জেরের এই দুই কিস্তি ধইর‍্যাই এই রহম। আগে এমন ভিড় আছিল্ না।

জয়গুন পাক চড়িয়ে শফীর মা-র ঘরে আসে। শফীর মা বলে—কয়দিন ধইর‍্যা একটা কথা কইমু কইমু করতে আছি। কিন্তু সময় মত এট্টু একখানে বইতে পারি না। তুমি থাকলে আমি থাকি না, আমি থাকলে আবার তোমার ত্থাহাই মিলে না।

—কি কতা?

—কই, সবুর কর। পান খাইলে একটু খা, ঐ দ্যাখ তোর পিছে পাতার মধ্যে।

জয়গুন পান খেতে খেতে বলে—কি কতা এইবার কও দেখি ভা'জ।

—রাখ্ না, কই। আমার এই কাপড়ডা একটু তালি দিয়া দিবি। আমি আবার সুঁয়ে সূতা গাঁথতে পারি না ছাই, চউখটা এক্কেরে গেছে।

—আইচ্ছা।

—ছিঁড়া কাপড় পিন্দা বাইরে যাইতে লজ্জা করে। তুই একটু সিলাইয়া দিলে তবু বেড় দিয়া পিনতে পারমু। তোর আতে সিলাইডা অয় ভালা।

—শফীরে দিয়া পাডাইয়া দিও। এই এর লাইগ্যা বোলাইছিলা? জয়গুন উঠতে উদ্যত হয়।

—না, আরো কতা আছে, ব'।

—কও কি কতা।

—ফকিরের লগে তোর দেহা অয় না, অ্যা? তোরা ত কত দূরে দূরে যাস। একদিনও চউখে পড়ে না?

—উঁহু।

—ছাখ দেখি কেমুন বে-য়াক্কেইল্যা! কতদিন গুজারিয়া গেল, বাড়ীর পাহারা আর বদলাইয়া দিয়া গেল না। আমার ত রাইতে ঘুমই আহে না ডরে। তুইও আমল দিবি না।

—উঁহু, পাহারা বদলাইতে অইব না আর। পাহারা না ছাই। ফুক্কা দিয়া টাকা নেওনের ছল-চক্কর।

ছল-চক্কর! তুই যে কী কস্! আইচ্ছা সূর্য-দীগল বাড়ীতে থাকতে তোর কি পরাণে ডর ভয় লাগে না?

জয়গুন আবার উঠতে উদ্যত হয়?

শফীর মা বাধা দেয়—ব'। আদত কথা তো অহনো কই নাই।

—কী আদত কতা, কও।

—তোরে আগেও কয়বার আমি কইছিলাম। তুই আমার কতা ঠেইল্যা দিলি।

—ঠেলমু না কি করমু?

—এইডা কি ঠেলনের মত কতা!

—তয় কি?

—তোর ভাই বাঁইচ্চা থাকলে তার কতা ঠেলতে পারতি? ধইর‍্যা বাইন্ধা কবে তোর নিকা দিয়া দিত।

—তুমি মোখ বোজ দেহি। তোমার ঐ এক বুলি আমার আর কানে সয় না।

—হেইয়া সইব ক্যাঁ? আমি তোর ভালার লেইগ্যা কই কি না। বয়স ত অহনো তিরিশ অয় নাই। অহনো গণ্ডা গণ্ডা বাচ্চা-কাচ্চা পেডে ধরনের বয়স আছে।

জয়গুন শ্রান্ত। সে মুখ নীচু করে বসে থাকে।

শফীর মা বলে—গদু পরধান মানুষ ভালা। তার পাঁচটা বলদ, তিনডা গাই। দশ মরাই ধান পায় বচ্ছর। জাগা-জমিনের ইসাব-কিতাব নাই। কাম আছে মানি। তয় আমি কই, যেইখানে কাম আছে হেইখানে ভাতও আছে। আর তোর ত একলা কাম করতে অইব না। আগের তিনডা জননা আছে পরধানের। চাইড্যা পোলার বৌ আছে। এক্কেরে সোনার বাগিচা হাজাইয়া রাখছে। ওরাই বেবাক কাম করব! তুই হুকুম দিয়া খাড়াবি।

জয়গুনের মুখ ছাই-এর মত ফ্যাকাসে হয়ে যায়। সে কিছু বলতে পারে না।

শফীর মা আবার বলে—পরধান কাইলও আমারে ধরছিল। আমি কইলাম, পোলা আর মাইয়াডার লেইগ্যাই যত মুস্কিল। হে কইল, তা পোলা আর মাইয়াডারে আমার বাড়ীতে লইয়া আইলেই ত অয়। কত মানুষ খাইয়া বাঁচে আমারডা। দুইডায় আর কি অইব! এইবার বিবেচনা কইর‍্যা তুই মোখ ফুইট্যা একটু হুঁ করলেই অইয়া যায়। সুখে থাকবি, কইয়া দিলাম।

খড়ের আগুনের মত দপ করে জ্বলে ওঠে জয়গুন—হুঁহ্, আমারে তাড়াইতে পারলে লুইট্যা-লাপইট্যা ফলার কইর‍্যা খাইতে পারবা। তা মনেও জাগা দিও না, কইয়া দিলাম।

—তোবা! তোবা! তোর চীজ ছুঁইলে যেন আত খইয়া পড়ে, তোগ গাছের একটা পাতা ছিঁড়লে যেন রাত না পোয়ায় আমাগ।

জয়গুন যেমন জ্বলে উঠেছিল, শফীর মা-র কথায় আবার নিবে যায়। সে তার স্বাভাবিক কণ্ঠে এবার বলে—না বইন, বিয়া ত দুই খানেই অইল। অনেক ছাখ্‌লাম, অনেক শিখলাম, আর না। পোলা মাইয়ার মোখ চাইয়া আর পারমু না, মাপ করো। পোলা আর মাইয়াডার বিয়া দেইখ্যা যেন চউখ বুজতে পারি, দোয়া কইর‍্যো।

শফীর মা নিরাশ হয়ে বলে—তোর ময়মনের বিয়া দে এইবার। একটা সম্বন্ধ আছে আতে।

—না, এত শিগ্‌গির কি অইল! যাউক আর দুই বচ্ছর।

—না, না। মাইয়া তোর বিয়ার লায়েক অইছে। আর ঘরে রাখন ঠিক না।

জয়গুন একটু চিন্তা করে বলে—কোথায় সম্বন্ধ আছে?

—সদাগর যাঁরে তুই ত চিনসই। তার নাতি—সোলেমানের ব্যাটা নামডা যেন কি! ভুইল্যাই গেলাম বুঝিন। অ-হো মনে পড়ছে ওসমান। ওসমান।

—ওঃ, ওসমান? ওসমান ত বিয়া করছে!

—করছিল। বউ মইর‍্যা গেছে চৈত্‌ মাসে ভেদের ব্যারামে।

—কিন্তু পোলার বয়স যে অনেকখানি।

—তোর মাইয়াডার বয়সই কম কি।

—কম না? আমার মাইয়ার বয়স মোডে দশ, ধরতে গেলে দুধের মাইয়া আমার।

—দুধের মাইয়া! কি যে কস্ তোরা ছাই-মুণ্ডু। মাইয়ারা এই বয়সে বাচ্চা বিয়ায়। আমার মা-র এগারো বচ্ছরের কালে আমার জর্ম অয়।

শফীর মা-র সাথে কথায় পেরে ওঠে না জয়গুন। সে বলে—আইচ্ছা

ভাইব্যা চিন্তা দেহি। পরে কইমু। নছিবে যদি ঐখানে ভাত লেইখ্যা থাকে, তয় অইব। কার কোনখানে দানা-পানি লেহা আছে, খোদা জানে। অহন যাই। ওদিকে আবার ভাতের আঁড়ি না ভাইঙ্গা ফালায়।

বাইরে নামতেই জয়গুনের চোখে পড়ে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। সে চারদিকে চেয়ে বলে—উত্তরে আর পুবে যে মেঘ করছে, ভা'জ! আইজ বুঝিন্ আসমান শুদ্ধা ভাইঙ্গা পড়ব। আইজ আর উপায় নাই। এই বষ্যাকালডা ভিজতে ভিজতেই গেল। তোমার ঘরের চাল ত ভালা আছে। আমার চালে ছনই নাই।

—আমার চালে আর কই আছে? হেই কবে, গেল বচ্ছরের আগে ঠিক করছিলাম। তব বিষ্টি পড়ে ছয় সাত জায়গায়।

—কি করমু আর! কপালে আছে ভিজতে অইব, ভিজমুই। পাঁচটা ট্যাকাও একখানে করতে পারলাম না। ঘরের চাল ছাওয়াই কি দিয়া। উদর লইয়া আর পারলাম না। উদরেই যায় বেবাক ট্যাকা।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছে। জয়গুন ঘরে যায়। মায়মুন রান্না শেষ করেছে।

—চালাক কইর‍্যা ভাত খা তোরা। আসমানের দিগে চাইছিলি? কাউয়ার আণ্ডার মতন কালা অইছে আসমান। আইজ আবার ঘরের মধ্যে সোত ছুটব। খাইয়া-লইয়া উত্তরমুখী বিছান সরা।

অসংখ্য ছিদ্রপথে বৃষ্টির পানি ঝরতে থাকে ঘরের ভেতরে। তাছাড়া দক্ষিণে বাতাসের জন্য বৃষ্টির ঝাপটা দক্ষিণ দিকটায় লাগে বেশী। তাড়াতাড়ি খেয়ে তারা বিছানা সরায় উত্তর দিকে।

জয়গুন বলে—একটা কাঁথাও পাইড়্যা নেগ্যা। তারপর কুঁকড়ি-মুকড়ি অইয়া শুইয়া থাক ভাই-বইনে।

বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করে জোরে। সত্যি সত্যি আকাশটাই ভেঙে পড়ছে যেন। এশার নামাজ পড়ে ছেলেমেয়ের শিয়রের কাছে তসবী হাতে বসে জয়গুন। সে তসবীর দানা গুণছে কি সময় গুণছে বোঝা যায় না। অনেকক্ষণ পরে বৃষ্টির বেগ কমে। কিন্তু বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয় না একেবারে। এখন যে রকম অলস বর্ষণ শুরু হয়েছে, তাতে সারা রাতেও বৃষ্টি থামবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। জয়গুন কাঁথার ওপর হাত দিয়ে দেখে, কাঁথাটা ভিজে গেছে। সে এক পাশে শুয়ে পড়ে।

হাসু হঠাৎ জেগে উঠে বলে—পায়ের কাছটা একদম ভিজ্যা গেছে, মা।

—তুই অহনো ঘুমাস নাই?

—উহুঁ।

আত-পা কাঁকড়ার মত গুড়িসুড়ি মাইর‍্যা পইড়্যা থাক।

দশ

এমন দিন পড়েছে, এক মুহূর্তের জন্যেও সূর্যের মুখ দেখা যায় না। সারাদিন টিপিরটিপির বৃষ্টি পড়ে। হাসু ঘরের বার হয় না। শরীরটাও ভালো নেই। শরীরের সমস্ত গিঁঠে গিঁঠে বিশেষ করে ঘাড়ে টনটনে ব্যথা হয়েছে।

হাসু মা-কে বলে গর্দানডায় বেদনা করেগো, মা। কেমুন শীত শীত লাগে।

হাসুর গায়ে হাত দিয়ে জয়গুন শঙ্কিত হয়। ছেলেটা জ্বরে পড়লে উপায় নেই। বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে ছেলেটাকে যেভাবে সে কাজে পাঠায় তাতে এই ছোট শরীরটার ওপর জুলুমই করা হয়। কচি ঘাড়টার ওপরেই জুলুমটা হয় বেশী। অথচ এই ঘাড়টা তাদের জীবন-মরণের কল-কাঠি। তিনটি প্রাণীর জীবনের বোঝা মাথায় নিয়ে হাসুর এই কাঁচা ঘাড়টা মাঝে মাঝে ব্যথাকাতর হয়ে পড়ে।

জয়গুন নিষেধ করে থাউক, আইজ আর কামে যাওন লাগব না। কাঁথা গায়ে দিয়া হুইয়া থাক। তোরে পইপই কইর‍্যা নিষুধ করি ভারী পোঝা মাতায় নিস্ না। তা হুনবি না।

বেশী লোভ করার জন্যে মাঝে মাঝে নিজেকে ধিক্কার দেয় জয়গুন। তেরো বছরের এতটুকু ছেলে কামাই করে খাওয়ায় এই ত বেশি। রোজগার করে সব পয়সা তার হাতে এনে দেয়। একটা পয়সাও এদিক-ওদিক করে না। এমন কি এক পয়সার চিনেবাদাম খেলেও তার হিসেব দেয় তার কাছে।

জয়গুন সর্ষের তেলের শিশি থেকে একটু তেল নিয়ে হাসুর ঘাড়ে মালিশ করতে করতে বলে—পায়ে তুঁইত্যার পানি দিছিলি কাইল ?

—উহুঁ।

—হেইয়া দিবি ক্যান। দেহি কেমুন অইছে ?

জয়গুন পায়ের ওপর থেকে কাঁথা সরিয়ে বলে—ছাখ্, ক্যাদায় চামড়া খাইয়া ঝাঁজরা কইর‍্যা দি'ছে।

একটা নারকেলের মালায় তুঁতে গোলা নিয়ে আসে জয়গুন। হাঁসের পালক ভিজিয়ে হাসুর পায়ের তলায়, আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে তুঁতের পানির পোঁচ্ দেয়।

হাসু উ-হু-হুঁ করে ওঠে। বলে—আর দিও না, মা। বড় পোড়ায়।

না দিলে চামড়া পইচ্যা যাইব এক্কেরে। আঁটতে পারবি না। রাস্তা-ঘাটে যেই ক্যাদা।

জয়গুন নিজের পায়েও তুঁতে গোলা দিয়ে প্রলেপ লাগায়। মায়মুনের

পায়েও লাগিয়ে দেয়। বাড়ীর উঠানে পর্যন্ত কাদা হয়েছে। পায়ের পাতা অবধি ডুবে যায় কাদায়। তুঁতের প্রলেপ দিলে পায়ের তলা অত হেজে যেতে পারে না।

পরের দিন চমৎকার রোদ ওঠে। জয়গুন হাসুর কপালে ও বুকে হাত দিয়ে দেখে। তার মুখের ওপর থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তার মেঘ কেটে যায়। প্রভাতী রোদের মত তার মুখ আনন্দে চিকচিক করে। হাসুকে ডেকে সে বলে ওঠ্, দ্যাখ্ আইজ কেমুন রউদ ওঠছে!

হাসু উঠে বসে।

জয়গুন বলে—আমার ত ডরেই ধরছিল। কাইল যেই রহম গরম আছিল শরীল। জ্বর ওডে নাই কপালের ভাগ্যি। কেমুন লাগছে রে শরীল?

—ভালা। আইজ কামে যাইমু, মা?

—আত-মুখ ধুইয়া আয়। খাইয়া তারপর চল্ যাই। আমিও যাইমু। চাউল ফুরাইছে। আইজ চাউল না আনলে ওই বেলা চুলা জ্বলব না।

হাসু, হাসুর মা কাজে বের হয়। হাসুর মা বার বার হাসুকে নিষেধ করে দেয়, খবরদার, ভারী পোঝা মাতায় নিবি না কিন্তুক। গর্দান ভাইঙ্গা যাইব।

কিন্তু হাসু দু'দিনের কাজ একদিনে করার সঙ্কল্প নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে। কাল কাজ হয়নি। আজ বেশী কাজ করে অন্তত কিছুটা পুষিয়ে নেওয়া তার চাই-ই।

হাসু নারায়ণগঞ্জ স্টেশনে আসে।

আজকাল যাত্রীর সংখ্যা খুবই বেড়েছে। বাইরের থেকে যেমন বহুলোক আসছে, আবার বাইরেও যাচ্ছে তেমনি। বিশ্রামঘরে গাদাগাদি হয়ে আছে লোক। জাহাজে গাড়ীতে জায়গা হয় না। অনেক যাত্রীকেই দু-তিন দিন স্টেশনে পড়ে থাকতে হয়। ছেলে-মেয়ে মা-বউ নিয়ে আবার অনেক বিদেশী আশ্রয় নিয়েছে স্টেশনের চালা ঘরে।

হাসু মোটের সন্ধানে এদিক ওদিক ঘোরে আর এদের দিকে চায়। তার অদ্ভুত লাগে এদের পোশাক। এদের কথাও বোঝা যায় না—হাসু কাছে দাঁড়িয়ে শুনেছে। এক জায়গায় একটি স্ত্রীলোক রুটি সেঁকতে শুরু করেছে। দুটি ছেলেমেয়ের লোলুপ দৃষ্টি তার ওপর। রেল লাইনের পাশেও এক জায়গায় সে একরকম আরো অনেক লোক দেখেছে আজ। হাসুর মনে পড়ে দুর্ভিক্ষের বছরের কথা। এ-রকম ভাবে মায়ের সাথে সাথে গাছ তলায় কত রাত কেটেছে। বৃষ্টির মধ্যে আশ্রয় নিতে গিয়ে কত লোকের তাড়া খেয়েছে। হাসু অনুমান করে, নিশ্চয় ওদের দেশে আকাল এসেছে।

যাত্রীর সংখ্যা বাড়লেও হাসু সুবিধা করতে পারে না। নম্বরী কুলিদের

জন্যে মোট ধরবার যো নেই। যাত্রী বেড়ে যাওয়ায় বরং অসুবিধা হয়েছে। ভিড়ের জন্যে ঘাটে জাহাজ ধরবার আগেই জেটির গেট বন্ধ হয়ে যায়। নম্বরী কুলি ছাড়া অন্য কুলিরা ঢুকতে পারে না। সে পানি সাঁতরে স্টীমারে ওঠে। কিন্তু নম্বরী কুলিরা দেখতে পেলে মাথার ওপর গাঁট্টা মারে। হাসু এই কুলিদের খুবই ভয় করে।

ট্রেন ও স্টীমারের সময় হাসুর মুখস্থ হয়ে গেছে। একটা ট্রেন আসবে দশটায়। দশটা বাজবার এখনো দেরী। হাসু রিক্সা স্ট্যাণ্ডের দিকে যায়। এগারোটার জাহাজে তারা সাধারণত এখানেই নামে রিক্সা থেকে।

এক ভদ্রলোকের মাল-পত্র নিয়ে দু'জন নম্বরী কুলির মধ্যে বচসা শুরু হয়েছে। হাসু দূরে দাঁড়িয়ে দেখে।

একটা কুলি বলে—আমি আগে ধরছি।

অন্যটি বলে—ছোড়দে। আপনি কিসকো লিবেন, বাবুজি?

আর একটা রিক্সা এসে থামে। চড়নদার ভদ্রলোকের সাথে ছোট একটা স্যুটকেস ও বিছানা। বোঝাটা বেশী ভারী হবে না। হাসুর মাথার পক্ষে উপযুক্ত বোঝাই। হাসু এগিয়ে যায়। স্যুটকেস ধরে জিজ্ঞাসা করে—কুলি লাগব নি' বাবু?

ঝগড়ায়রত কুলিদের একজন তার প্রতিদ্বন্দ্বী কুলিকে বোঝাটা ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে আসে। হাসুকে হাত দিয়ে সরিয়ে বলে—ভাগ ব্যাটা।

হাসু নিঃশব্দে সরে যায়। একটা লাইট-পোস্টে পিঠ ঠেকিয়ে সে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে। রিক্সায় কোন যাত্রী এলে সে আগেই আন্দাজ করে, ঘাড়ে কুলোবে কিনা। তার উপযোগী মোট না হলে সে এক পা নড়ে না, লাইট-পোস্টের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে সে দাঁড়িয়েই থাকে। অনেকক্ষণ পরে যদি বা মোট পাওয়া যায়, তাও নম্বরী কুলিদের ফাঁকি দিয়ে নেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।

দূরে হুইসিল শোনা যায়। একটা ট্রেন আসছে। হাসু স্টেশনে ঢোকে। ট্রেনেই যা কিছু সুবিধা করা যায়। এখানে নম্বরী কুলিদের ফাঁকি দেওয়া যায়। পেছনের দিকের গাড়ীগুলোর থেকে মোট নিয়ে সরে পড়লে তারা দেখতে পায় না। কিন্তু এখান থেকে মোট বয়ে রিক্সায় তুলে মোট পিছু দু'আনার বেশী পাওয়া যায় না। পথ কম বলে দু'আনার বেশী আশাও করা যায় না। জাহাজের মোটে পয়সা বেশী। মোট পিছু চার আনা। এখানকার দুই মোটের সমান। কিন্তু খাটুনিও ডবল।

ট্রেন থামতেই হাসু চটপট উঠে পড়ে পেছনের একটা গাড়ীতে। একটা মোট দু'আনায় ঠিক করে। যাদের মাল-পত্র কম তারা এ রকম ছোট কুলিই খোঁজে। এদের দু'আনা দিলেই খুশী হয়। বড় কুলিরা চার আনার কমে রাজী হয় না।

হাসু গাড়ী থেকে নেমে দেখ-না-দেখ সরে পড়ে।

বারোটার মেল ও একটার স্পেশাল জাহাজ ধরে হাসু রোদে এসে দাঁড়ায়। তার সমান আকারের আরো পাঁচ-ছ'টি কুলিও গামছা দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে আসে। ওভারব্রিজের রেলিং-এ সকলে সারি সারি গামছা রোদে দেয়।

গামছা পরে সাঁতার দিয়ে স্টীমারে উঠতে হয় তাদের। নম্বরী কুলি ছাড়া জেটির দরজা দিয়ে অন্য কুলিরা ঢুকবার সুযোগ পায় না। তারা সাঁতার দিয়েই অনেক সময় স্টীমারে ওঠে।

হাসু ও অন্যান্য খুদে কুলিরা বসে বসে গল্প করে। একজন একটা বিড়ি ধরায়, কয়েকজন তার দিকে হাত বাড়িয়ে চেয়ে থাকে, কে কার আগে নিয়ে টানবে।

একজন বলে—শীত লাগছেরে। দে দিহি বিড়িডা, একটা টান দিয়া লই।

আর একজন বলে—ওয়াক থু, ওর মুখের বিড়ি টানিস না। ছি! ও মেথরের পোলা।

—মেথর বুঝি মানুষ না? রমজান বলে।—পয়সা পাইলে মেথরগিরিও করতে পারি। চাই পয়সা। রমজান হাতে তুড়ি দিয়ে দেখায়।

জনপ্রতি দুটো করে টান দেয়ার পর ফেলে দেয়া হয়েছিল বিড়িটা। যে ছেলেটা মেথর বলে থুক ফেলেছিল, সে এবার বিড়িটা তুলে টানতে আরম্ভ করে।

একটা ছেলে গলা ছেড়ে সিনেমার গানে টান দেয়—মালতী লতা দোলে—

রমজান হাসুকে ডাকে—ও দোস্ত খুব ভালা একটা সিনেমা আইছে। যাইবেন নি আইজ?

হাসু বলে—না দোস্ত মা রাগ করব।

—চলেন না আইজ। তিন আনার পয়সা মোডে। আমার গাঁটের পয়সায়ই না অয় দেখবেন?

—উঁহু

রমজান আর পীড়াপীড়ি করে না।

রমজান হাসুর বন্ধু ও খুদে কুলিদের সরদার। রমজানকে সবাই ভয় করে। তার কথামত সবাইকে চলতে হয়। তবে হাসুকে খুবই খাতির করে সে।

রমজান বলে—তরগুর তন তোরা আমার লগে এক জায়গায় কামে লাগবি।

হাসু জিজ্ঞাসা করে—কোন্‌খানে দোস্ত?

—হোসেন দালালের নাম হোন্‌ছেন? নতুন ধনী হোসেন দালাল?

একজন বলে—হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনছি। পাডের দালালি কইর‍্যা বস্তাবস্তা ট্যাকা করছে ব্যাডা।

রমজান বলে—হ্যাঁ, হেই হোসেন দালাল! খানপুরে তেতলা দালান খিঁচব এইবার। হেই জায়গায় কাম আছে।

—কি কাম?

—ইট ভাঙ্গবি, ইট টানবি, পানি তুলবি। এক ট্যাকা কইর‍্যা রোজ।

সবাই রাজী হয়।

রমজান আবার বলে—আমারে মাথা পিছু সরদারি দিবি এক আনা কইর‍্যা। ছাখ, যদি মনে খাডে লাইগ্যা যা তোরা সবাই।

এখানে সারাদিনে দশ বারো আনার বেশী পাওয়া যায় না। কোনদিন তার চেয়েও কম পাওয়া যায় সুতরাং কেউ অমত করে না।

ছয়টার ট্রেন ধরে হাসু পয়সার হিসাব করে। মাত্র তেরো আনা হয়েছে। একটা টাকার কাজও হল না। কোমরে-বাঁধা জালির মধ্যে পয়সাগুলো গুঁজে সে এক জায়গায় বসে। হাসুর সাথীরা সব চলে গেছে। রোজ এমন সময় সেও বাড়ীর দিকে পথ নেয়। কিন্তু আজ সাতটার স্টীমারটা দেখেই যাবে সে। মা হয়ত বসে থাকবে তার জন্যে। দেরী হলে রাগ করতে পারে। কিন্তু একটা টাকা পুরিয়ে নিলে রাগ না করে সে হয়ত খুশীই হবে।

ছড়ি হাতে এক ভদ্রলোক হাসুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হাত থেকে সিগারেটের শেষাংশ ছুঁড়ে ফেলতেই হাসু মাটি থেকে তা কুড়িয়ে নিয়ে টানতে আরম্ভ করে। দোস্তের পাল্লায় পড়ে কয় দিন হয় সে বিড়ি টানতে শিখেছে। ঠাণ্ডার মধ্যে বিড়ি টানতে মন্দ লাগে না হাসুর।

সাড়ে সাতটার পরে স্টীমার আসতে দেখা যায়। হাসু তিন নম্বর জেটির দিকে দৌড়ায়। গেট বন্ধ হয়ে গেছে। হাসু ফিরে এসে গামছা পরে লুঙ্গিটা বেঁধে নেয় মাথায়।

স্টীমারটা ঘাটে ধরতেই সে সাঁতার দেয়। আজ একা একা তার ভয় করে। অন্য সময় ছয় সাতজন মিলে নদীর পানি তোলপাড় করতে করতে তারা জাহাজে ওঠে।

যে ফ্লাটের গায়ে স্টীমারটা ধরেছে তার একটা কাছি বেয়ে বেয়ে সে আগে ফ্লাটের ওপর ওঠে। লুঙ্গি পরে গামছার পানি নিঙরে সে শরীরটা মুছে নেয়। তারপর ফ্লাটের কিনারার সরু পথ ধরে ধরে স্টীমারে উঠবার সিঁড়িতে যায়। ভিড় গলিয়ে এবং নম্বরী কুলিদের চোখ এড়িয়ে সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে।

এক মোটা ভদ্রলোক কুলির সাথে দরাদরি করছেন—চার আনায় যাবে? অল্প মাল আমার, সব শুদ্ধ দশ সেরও হবে না।

—ছয় আনা রেট আছে সাব। কমে অইব না।

—না, যাও। চার আনার বেশী দেব না আমি। কুলিটি চলে যেতেই হাসু এগোয়—কুলি লাগব নি' বাবু।

—লাগবে ত। কত নিবি ?

—আপনে খুশী অইয়া যা দ্যান।

—তবে মাথায় নে। চল জলদি।

মোট মাথায় নিয়ে হাসু অনুমান করে—কোথায় দশ সের ? স্যুটকেসটার ওজনই বিশ সেরের কাছাকাছি হবে। যেন সীসা ভরা আছে স্যুটকেসটায়। তার ওপর বিছানা। হাসুর মাথায় ভারী লাগে বোঝাটা। ভদ্রলোক এবার টেবিলের ওপর থেকে খবরের কাগজ ও একটা হাতব্যাগ নিয়ে হাসুর হাতে চাপিয়ে দেন।

জেটি পার হবার সময় একজন ডাকেন—আরে রশীদ, তোর জন্যে সাড়ে ছ'টা থেকে অপেক্ষা করছি। তোর বাড়ীতে খবর নিয়ে জানলাম তুই আজ আসছিস।

দু'জনের করমর্দন ও কুশলবার্তার পরে আলম সাহেব বলেন—তোর জন্যে অপেক্ষা করছি কেন জানিস ?

—আরে হ্যাঁ-হ্যাঁ। কোথায় বল দেখি ?

—প্যারাডাইসে, হুজ্জতুল্লা আর নির্মল বসে আছে। তুই না হলে যে জমেই না!

রশীদ সাহেব বলেন—যে রকম দেখছি তাতে পাকিস্তানে সোমরস পান বুঝি আর সম্ভব হবে নারে।

—সব বে-রসিক !

আলম সাহেবের সাথে রশীদ প্যারাডাইস ক্যাফেতে গিয়ে ওঠেন।

হাসুকে বলে যান—তুই বোস এখানে বাইরে।

হাসু মোট নামিয়ে বসে থাকে। 'ক্যাফের' ঘড়িতে ন'টা বাজে। কিন্তু সাহেবের বের হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। বসে থাকতে থাকতে হাসুর বিরক্তি ধরে যায়। একবার মনে হয়—স্যুটকেসটা নিয়ে ভেগে গেলে কেমন হয় ? কিন্তু তারপরই সে নিজেকে শুধরে নেয়।

রশীদ সাহেব বাইরে এসে চলতে আরম্ভ করেন। হাসু অনুসরণ করে। ওভারব্রিজের কাছে আসতে হাসুর পা আর চলতে চায় না। বোঝা মাথায় সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা খুবই কষ্টকর। ক্ষুধায় হাসুর শরীর দুর্বল। তার ওপর এমন ভারী বোঝা।

হাসু বলে—একটু ধরেন, জিরাইয়া লই।

—চলে আয়। এতটুকুর জন্যে জিরিয়ে কাজ নেই, বাবা। বেশী দূরে নয়, কাছেই আমরা বাড়ী।—রশীদ সাহেবের মুখ দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বের হয় কথাগুলো।

রশীদ সাহেব না থেমে ওভারব্রীজের ওপর দিয়ে এগিয়ে যান। হাসু এক

সিঁড়ি দুই সিঁড়ি করে উঠতে থাকে। তার পা কাঁপে। ঘাড়টা চাপ খেয়ে মচকে যাবার মত হয়।

রশীদ সাহেবের আগমনে তাঁর ছেলে মেয়েদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেছে। তাদের আনন্দ কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে বাড়ীখানা। ছোট ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে অন্য দুটির হাত ধরে তিনি অন্দরে ঢোকেন। একটি চাকরানী এসে হাসুর মাথার মোট নামিয়ে নেয়। হাসু দাঁড়িয়ে থাকে বাইরে।

রাত হয়ে যাচ্ছে অনেক। কিন্তু তাকে পয়সা দেয়ার কথা বোধ হয় মনে নেই করো।

অনেকক্ষণ পরে হাসু সাহস করে বলে—আমারে বিদায় করেন সা'ব।

রশীদ সাহেবের ছেলে মজিদ হাসুকে ডেকে নিয়ে যায় ভেতরে।

রশীদ সাহেব তখন বিরাট বপু বিস্তার করে শুয়েছেন। মজিদকে বলেন, পকেট থেকে তিন আনা বের করে দিতে।

হাসু আপত্তি করে—তিন আনা কম অইয়া যায় সা'ব।

—কম! বলিস কী, অ্যাঁ!

—জাহাজের তন রিক্সায় উডাইয়া দিলেই ত চাইর আনা দেয়। আর এইডা ত অনেকখানি দূর। আবার দেরী অইল কত!

—নে তোল্ পয়সা।

—না সা'ব, পাঁচ আনার কম নিমু না।

মজিদ বলে—বাপরে! এখান থেকে এখানে পাঁচ আনা! এক মিনিটের পথ না, এত পেলে ত রাজা হয়ে যাবি!

হাসু নাছোড়বান্দা।

রশীদ সাহেব এবার ডাকেন—এই ছোঁড়া, আয় পাঁচ আনাই দেব। তবে হাত-পাগুলো টিপে দে ত আমার। ভালো করে তেল-মালিশ করে দে।

—না সা'ব আমি পারতাম না। আমার দেরী অইয়া গেছে।

—অ্যাঁ, পারবিনে? গর্জে ওঠেন রশীদ সাহেব। বিছানার ওপর মেদবহুল শরীরখানা দুলিয়ে তিনি বলেন—এমনি এমনি তোমাকে পাঁচ পাঁচ গণ্ডার পয়সা দেব? আমি কণ্ট্রাক্টর। কড়ায় গণ্ডায় কাজ আদায় করে পয়সা দিই। হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ।

হাসু রশীদ সাহেবের পায়ের কাছে বসে তার পায়ে তেল-মালিশ করতে শুরু করে।

তেল মালিশ নেওয়া রশীদ সাহেবের অনেক দিনের অভ্যাস। শোবার আগে রোজ হাত-পা টিপিয়ে না নিলে তাঁর ঘুম হয় না। কলকাতা থাকতে এ ব্যাপারে সুবিধে ছিল অনেক। চার আনা দিলে আধ ঘণ্টা বেশ হাত-পা

বানিয়ে নেয়া যেত। রাত ন'টার সময় বাসার দরজায় এসে রোজ চীৎকার করে উঠত—মালিশ, তেল মালি—শ। বাড়ীতে সে স্থবিধে না থাকায় ঝি-চাকর দিয়েই চলে সে কাজ।

দশটা বাজে। পা টিপতে টিপতে হাস্থ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। মা-র কথা মনে পড়ে। রেল-রাস্তার ধারে মা তার পথ চেয়ে আছে। এতক্ষণ এ লোকটার ব্যবহারে তার মনটা বিষিয়ে উঠেছিল। তাই ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা তার মনেই ছিল না। কিন্তু এখন ক্ষুধায় তার হাত-পা অবশ হয়ে আসে। পেটটা ব্যথা করতে আরম্ভ করে।

মা-র কথা ভাবতে ভাবতে পা-টেপা এক সময়ে বন্ধ হয়ে যায়। রশীদ সাহেব বলেন—কিরে থামলি কেন? কি টেপা টিপিস? গায়ে কী জোর নেই বাপু? খোট্টারা এ কাজে ভারী ওস্তাদ। কলকাতায় ভুলুয়া বলে একটা খোট্টা রোজ আসত আমার বাসায়। চমৎকার টিপতে পারত সে। আর তুই টিপিস, আমার গায়েই লাগে না। মনে হয় পিঁপড়ে হাঁটছে শরীর বেয়ে।

কতক্ষণ পরে আবার বলে—এবার হাতের দিকে আয়।

রশীদ-গৃহিণী চা হাতে থমকে দাঁড়ান। তিনি রুক্ষস্বরে বলেন—ওঃ সব কাজেই ঠিকাদারী! আচ্ছা কি আক্কেল তোমার! কার ছেলেকে তুমি এ রকম করে আটকে রেখেছো?

রশীদ সাহেব বলেন—আমার নাম রশীদ কণ্ট্রাক্টর। কড়াক্রান্তি পর্যন্ত আদায় করা চাই আমার। এই ছোঁড়া, এবার হাতগুলো টিপে তারপর যাবি।

চায়ের কাপটা রেখে রশীদ-গৃহিণী বলেন—থাক আর হাত টেপাতে হবে না। কেন তুমি পরের ছেলেকে কষ্ট দেবে?

হাস্থর দিকে ফিরে আবার বলেন—আয় ত বাবা। আহা! কার ছেলে গো! তোর কি মা-বাপ নেই?

সহানুভূতির কথায় এবার হাস্থর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি ঝরে।

রশীদ-গৃহিণী হাস্থর মুখ দেখে বিস্মিত হন। নিজের আঁচলে চোখ মুছিয়ে তিনি বলেন—দুপুরে খাসনি কিছু? আহা! মুখখানা শুকিয়ে কেমন হয়েছে!

মায়ের মন ক্ষুধাতুর সন্তানের জন্যে ব্যথিত হয়। তার চোখও শুকনো থাকে না।

তিনি হাস্থকে খাবার ঘরে নিয়ে যান। একটা থালায় ভাত ও দুটো পেয়ালায় তরকারী দিয়ে হাস্থর সামনে দেন।

ভাতের দিকে চেয়ে হাস্থর চোখে ভাসে—মা তার আশায় সন্ধ্যা থেকে বসে আছে। মায়মুন বাড়ীতে ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে। বাড়ী গেলে রান্না হবে।

তারপর খাওয়া হবে সকলের। হাসুর চোখ দিয়ে এবার বেশী করে পানি ঝরতে থাকে।

রশীদ-গৃহিণী বলে চলেন—খেয়ে নে বাছা আমার। কাঁদিস নে আর। হাসু জোর করে এক মুঠো ভাত মুখে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু ভেতরে ক্ষুধার তাগিদ চাপা পড়ে গেছে।

সে হাত ধুয়ে উঠে পড়ে। বলে—আমি যাই।

—কিছুই তো খেলিনে। শান্ত হয়ে খেয়ে এখানেই থেকে যা আজ।

—উঁহুঁ, আমি যাই।

—বাড়ীতে কে আছে তোর ?

হাসু কোন উত্তর দিতে পারে না।

রশীদ-গৃহিণী একটা টাকা এনে হাসুর হাতে দেন। অনেক দ্বিধার সঙ্গে টাকাটা নিয়ে সে বেরিয়ে যায়। রশীদ-গৃহিণী চেয়ে থাকেন ছেলেটার মুখের দিকে। তার মেজ ছেলের কিছুটা ছাট আসে ওর মুখে। তখন কলকাতায় দাঙ্গা। ছেলেটি একদিন তার সাথে রাগ করে সামনের ভাত ফেলে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। আর ফিরল না…

হাসু সিঁড়ির গোড়ায় নেমে একবার ফিরে তাকায়। রশীদ-গৃহিণীর চোখ থেকে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

ঢং-ঢং, ঢং-ঢং—এগারোটার ঘণ্টা। পথে আসতে আসতে হাসু শোনে।

যেখানটায় রোজ কোষা রাখা হয়, সেখানে এসে দেখে, মা বসে নেই। কোষাটাও নেই।

মা তার উপর রাগ করেই চলে গেছে, সে বুঝতে পারে।

হাসু অন্ধকারের মধ্যে হাত কচলাতে শুরু করে। রাতটা কোথায় কাটানো যায় ? দোস্তের বাড়ী অনেক দূরে, তাও আবার নদীর ওপারে। এত রাতে খেয়া পাওয়া যাবে না।

নিরুপায় হয়ে হাসু কয়েক পা হেঁটে ছোট রেল স্টেশনটার চালাঘরে গিয়ে ওঠে। রাতটা এখানে কাটানো যাবে। কিন্তু ক্ষুধা পেয়েছে খুব। এত রাত্রে খাবার কিছু পাবার যো নেই। দু'মাইল হেঁটে চাষাড়া পর্যন্ত গেলে কিছু কিনে খাওয়া যেত। কিন্তু তার এক পা হাঁটতেও আর ভালো লাগে না।

হাসু বসে পড়ে। যখন বসতেও খারাপ লাগে তখন এক সময়ে গামছা বিছিয়ে সে শুয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে সে বাড়ীর কথা মনে করে। মায়মুনকে খাইয়ে মা নিজে না খেয়ে শুয়ে শুয়ে তার কথাই ভাবছে। তাকে না খাইয়ে সে কোনদিন একমুঠো ভাত মুখে দেয়নি, আজও দিতে পারে না। মায়ের কথা ভাবতেই আরো একজনের কথা তার মনে পড়ে। মায়ের মুখের পাশে,

মায়ের মর্যাদা নিয়ে যে একখানা মুখ তার চোখের সামনে ভাসে, সে মুখখানা রশীদ-গৃহিণীর।

রাত বারোটার পরে আর কোন ট্রেন নেই। ট্রেনটা চলে যাওয়ার পর স্টেশনে লোক দেখা যায় না।

সব নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে দূর থেকে সমবেত চিৎকার ভেসে আসে—আল্লা আল্লা বল ভাইরে মোমিন—

কোথাও কলেরা-বসন্ত লেগেছে। তার জন্যেই খোদাই শিরণী হচ্ছে, হাসু বুঝতে পারে। চীৎকার শুনে তার শরীরের লোম কাঁটা দিয়ে ওঠে।

জয়গুন সন্ধ্যার পরেই এসেছিল। পথ চেয়ে চেয়ে তার মেজাজ গরম হয়ে ওঠে ছেলের ওপর। ন'টার সময় সে নিজেই কোষাটা বেয়ে বাড়ী চলে যায়। তার মনে হয়েছিল—হাসু হয়ত তার দোস্তের বাড়ী বেড়াতে গেছে। কিন্তু বাড়ীতে পা দিয়েই তার ধারণা পাল্টে যায়। হাসু তার সে ছেলে নয়! তার কাছে না বলে কোথাও সে যায় না। দোস্তের বাড়ী গেলে তার কাছে বলেই যেত।

জয়গুনের মাথার মধ্যে নানা রকমের দুশ্চিন্তা তাল পাকাতে আরম্ভ করে।

—কাল শরীর গরম ছিল, আজ হয়ত জ্বর হয়ে কোন গাছতলায় পড়ে আছে। পানি সাঁতরে স্টীমারে উঠতে হয়। তবে কি স্রোতে ভেসে গেল? নদীতে কুমীর থাকে। কুমীরেও টেনে নিয়ে যেতে পারে। কিছুই অসম্ভব নয়।

জয়গুন কুপী জ্বালে। মায়মুন ভূতের ভয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে আছে।

জয়গুন কাঁথা সরিয়ে দেখে মায়মুন ঘুমিয়ে আছে। সে আর মায়মুনকে ডাক দেয় না। এখন ওকে তুললেই ভাতের জন্যে কাঁদবে। ঘুমিয়ে থাক, সেই ভালো। আজ জয়গুনের চুলো ধরাবার শক্তিটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেছে। খাঁচার নিচে বড় হাঁস দুটোও দেখা যায় না। বর্ষার দিনে পাতিশিয়ালে নেয়ার কথাও নয়। বোধ হয়, কেউ ধরে রেখেছে কিম্বা জবাই ক'রে খেয়েছে।

জয়গুনের কাছে সমস্ত দুনিয়াটা এলোমেলো মনে হয়।

মায়মুনের পাশ দিয়ে সে শুয়ে পড়ে। এবার দুশ্চিন্তার দুর্বার স্রোত মাথায় ঢুকবার সুযোগ পায়। জয়গুন ভাবে—তবে কি গাড়ী চাপা পড়ল? হয়ত কিছু চুরি করায় পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।

এমনি আরো অনেক চিন্তা তার মনে আসে। একটা কিছুক্ষণ ভাবার পর সেটাকে সরিয়ে আর একটা নতুন দুশ্চিন্তা এসে জাঁকিয়ে বসে মনে।

এগারো

কুউ—ক্রু—ত—কু—উ—

মোরগের ডাক শুনে জয়গুন আর বিছানায় পড়ে থাকে না। তাড়াতাড়ি উঠে ফজরের নামাজ পড়ে, তারপর মায়মুনকে ডাকে—গা তোল, মায়মুন। আত-মোখ ধুইয়া জলদি কইর‍্যা চুলা জ্বাল।

—মিয়াভাই আহে নাই, মা ?

—উঁহুঁ।

জয়গুন আর কিছু না বলে কোষায় ওঠে। অনভ্যস্ত হাতে লগি বেয়ে সে রেল রাস্তার পাশে আসে।

বিলের শেষ প্রান্তে গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্য উঁকি দিচ্ছে।

আবছা আলোয় দূর থেকে জয়গুন দেখতে পায় স্টেশনের চালাঘরে হাসু গোল হয়ে শুয়ে আছে। কাছে গিয়ে হাত রাখতেই হাসু ধড়ফড়িয়ে ওঠে। মা-কে সামনে পেয়ে তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে।

জয়গুন দেখে, হাসুর সারা মুখে মশার কামড়ের দাগ। চোখ দুটোও লাল। মুখে ভয়ের সুস্পষ্ট ছায়া! সে বলে—ডরে ধরছিল, অ্যাঁ ?

হাসু মাথা নেড়ে স্বীকার করে।

—ডরে ধরছিল! কিছু দেখছিলি নি ?

—হ। কি ঘুডঘুইড্যা আন্ধার গো মা! একটা মাইন্‌ষের আলয় নাই। এইহানে ওইহানে এট্টু পরে পরে কিয়ের জানি খচ-খচানি। বিলের মধ্যে কিয়ের যেন বাত্তি—এই জ্বলে, এই আবার নিবে। আবার কিয়ের বিলাপ হুনলাম। মাইন্‌ষের মতন কান্দে। ডরে আমি এক্কেরে মাডির লগে মিশ্যা আছিলাম। এই আলোগুলা আলৈয়া, না মা ?

—যাউক, অই হগল কওয়ন ভাল্ না। তোর অহনও ডর করে অ্যাঁ ?

হাসু হাঁ-সূচক মাথা নাড়ে।

—না—না, ওগুলা কিচ্ছু না।

পথে আসতে আসতে হাসু কালকের সমস্ত ঘটনা মা-র কাছে বলে। রশীদ-গৃহিণীর দেয়া টাকাটা মা-র হাতে তুলে দেয়।

বাড়ীর ঘাটে কোষা ভিড়ার শব্দ পেয়ে মায়মুন দৌড়ে আসে। শফী, শফীর মা-ও আসে।

শফীর মা জিজ্ঞেস করে—কোনখানে পাইলি গো ?

—ইস্টিশনে হুইয়া আছিল।

—ইস্টিশনে আছিল! একলা! তুই বড় নিডুর গো! মা অইয়া কেমুন কইর‍্যা পেডের বাচ্চারে ফালাইয়া চইল্যা আইছিলি !

শফী বলে—ছাহ মা, মোখটা কেমুন দরমা-দরমা অইয়া গেছে!

—দরমা দরমা অইয়া গেছে!

হাসু বলে—মশার কামড়। সারা রাইত—

বাধা দিয়ে শফীর মা বলে—মশার কামড়, না আর কিছু! তোরা ছাখ্ দেহি ভাল কইর‍্যা চউথ লাগাইয়া। আমি আবার চউখে দেহি না।

জয়গুন ভালো করে দেখে বলে—মশার কামড়ই।

—নালো, আমার কিন্তুক ভালা ঠেকে না। দিনকাল খারাপ। শেখপাড়ায় এক ঘরও বাদ নাই। মোল্লা পাড়ায়ও দয়া অইছে। আমি এই ডরেই আর খ'রাত করতে ঠ্যাং বাড়াই না ওই মুহী। হোনলাম ছয়জন পাড়ি দিছে।

হাসু শিউরে ওঠে ভয়ে। সে নিজের কানেও শুনেছে খোদাই শিরনি দেওয়ার চীৎকার।

জয়গুন চিন্তিত হয়। বলে—রাইতে ডরেও ধরছিল, ভাজ। আমারও চিন্তা লাগে।

শফীর মা চমকে ওঠে। সে আবার বলে—তোরা কি কথা কস! আমার এক্কেরেই ভালা ঠেকে না।

—অহন কি উপায় করি, বইন?

—এক কাম কর। গোসল না করাইয়া ওরে ঘরে নিস্ না। সোনারূপার পানি দিয়া গোসল করাইয়া তারপর ঘরে লইয়া যা।

হাসুর মা হাসুকে বলে—তুই অহন বাইরে থাক। গোসল কইর‍্যা তারপর ঘরে গিয়া ভাত খাবি। এতক্ষণই যহন থাকতে পারলি, এডুকে আর কি অইব? তারপর শফীর মা-কে উদ্দেশ করে বলে—তোমার ঘরে রূপা আছে নি ভাজ। সোনা ত নাই জানি।

—নালো, বইন। রূপাও নাই। কবে বেইচ্যা খাইছি। আকালে কি আর কিছু রাইখ্যা গেছে? বেবাক ছারখার কইর‍্যা লইয়া গেছে, খালি শফীরে রাইখ্যা গেছে। শফীই আমার সোনা, শফীই আমার রূপা, ও-ই সব। এখন খোদায় মোখ চাইলে অয়।

—খাড়ু জোড়া, হেইও খাইছ? আহা কেমুন সোন্দর জল-তরঙ্গের খাড়ু আছিল তোমার। আমার এতডি বয়স অইল, ওই রহম খাড়ু আর চউখে ছাখলাম না।

—কত আশা আছিল দিলে। শফীরে বিয়া করাইলে ওর বউরে দিমু খাড়ু জোড়া। কিন্তু উদরের টানে তাও দিলাম বেইচ্যা। সোয়ামীর চিহ্নত একটা ভাতের কাডিও রইল না আর।

শফীর মা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে।

জয়গুন বলে—অখন কোথায় পাই সোনা-রূপার পানি? মোড়ল বাড়ীর

বউ-ঝিগ গায়ে রূপার গয়না আছে। কিন্তু সোনার গয়না ধারে-কাছে কার ঘরে আছে আমার ত চউখেই পড়ে না।

—ক্যান্, যার আছে হের আছেই। আমাগ মতন পোড়াকপাল কি আর বেবাকের! খোরশেদ মোল্লার বাড়ীতে আছে। কিন্তুক হেই বাড়ীর লাগা পরের বাড়ীতেই গুডির ব্যারাম। হ, এক কাম কর। গদু পরধানের বাড়ীতে গেলেই পাবি। গদু পরধানের বউগ শরীল গয়নায় ঝিল্লিক মারে। তুই আমার কথা হুন্‌লে তোর শরীলও আইজ সোনা-দানায় ভরা থাকৃত। আইজগা আর বিচ্‌রান লাগত না।

জয়গুন বিরক্ত হয় শফীর মা-র ওপর। সে বলে—চান্দের মইদ্দে ফান্দের কথা ক্যান্ আনো? কেরামতের বউর একজোড়া সোনার কানফুল দেখছিলাম।

—ইস! সোন না আরো কিছু! ক্যামিকল, হুনছি আমি! হেই যে আমার দাদী কইত কথা—দড়ি যদি হাপ অইত আর অজ্জা যদি রাজা অইত! হ, সোনার এক জোড়া মুড়কি আছিল্ জালালের বউর। হেদিন গিয়া দেহি বউর কান খালি। জিগাইলাম, তোর কান যে খালি বউ? হে কইল—মুড়কি বেইচ্যা কাপড় কিনচি। কাপড় আগে না গয়না আগে? হাচা কথাই ত। কাপড় না থাকলে কি গয়না ধুইয়া পানি খাইব মাইন্‌ষে?

জয়গুন বলে—গদু পরধানের বাড়ীত্ আমি যাইতে পারতাম না। তোমার শফীরে পাডাইয়া গ্রাও। মায়মুনও যাইব লগে।

শফীর মা বলে—যা শফী চিল-সত্বর চইল্যা আবি। কোনখানে দেরী করিস না কিন্তুক।

একটা মেটে ঘটের মধ্যে সোনা ও রূপার গয়না-ধোয়া পানি নিয়ে কয়েক পা এসেই মায়মুন বিস্ময়ের স্বরে বলে—গ্রাখলা শফী-ভাই? এমুন মোট্টা মোট্টা রূপার গয়না বেডীগো গায়ে! আবার সোনার গয়নাও আছে!

—তোরে এই বাড়ীতে বিয়া দিমু। এই রহম মোট্টা মোট্টা গয়না পরতে পাবি। কেমুন?

মায়মুন দাঁত বের করে ভেঙচি কাটে, জবাব দেয়—তোমার বউ নিমু এই বাড়ীত্‌তন। ওই যে ছেঁড়ি কোদালের মতন দাঁত—

মায়মুন হাঁসের ডাক শুনে পাশের দিকে চেয়ে দেখে খাঁচায় বাঁধা দুটো হাঁস তাদের দিকে চেয়ে প্যাঁক-প্যাঁক করে ডাকছে। মায়মুন চিন্‌তে পারে—তাদেরই হাঁস যে! হাঁস দুটোও মায়মুনকে চিন্‌তে পেরে খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

মায়মুন আস্তে আস্তে শফীকে বলে—শফী ভাই গ্রাখছো? আমাগো আঁস ছুইডা বাইন্দা থুইছে।

শফী চোখ দুটো বড় বড় করে বলে—অ্যা, সত্যই নি !

—কাইল রাইতে ওইগুলা বাড়ীত্ যায় নাই।

—বাড়ীত্ যায় নাই ! তুই পানির ঘটটা লইয়া কোষায় গিয়া ব'। আমি ফাঁক বুইঝ্যা ছাইড়া দিয়া পলাইমু।

শফী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সুযোগের সন্ধানে। গদু প্রধানের শেষ পক্ষের স্ত্রী ওকে দেখতে পেয়ে বলে—কি চাস্‌রে ছেঁড়া ওইহানে ?

—কিছু না। সোনা-রূপার পানি নিতে আইছিলাম।

সে চোখের আড়াল হতেই শফী এক টানে খাঁচাটা উল্টে দিয়ে পালায়। হাঁস দুটো দৌড়ে গিয়ে পানিতে নামে।

শফী কোষাটাকে জোরে বেয়ে নিয়ে যায়। চকের মাঝে গিয়ে কোষা থামিয়ে মায়মুন ডাকে—চঁই-চঁই-চঁই।

পরিচিত কণ্ঠের ডাক অনুসরণ করে হাঁস দুটোকে ধানখেতের আল দিয়ে আসতে দেখা যায়। মায়মুনের ডাক শুনে গদু প্রধানের বাড়ীতে হাঁস দুটোর খোঁজ পড়েছে। সেই বাড়ীর কুড়ি খানেক ছেলেমেয়ে বাড়ীর নীচে পানির কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। একটি ছোট মেয়ে চেঁচিয়ে বলে—কতগুলা ধান খাইছে আমাগ ! আবার ধরতে পারলে গলা কাইট্যা খাইমু।

শফী লগি উঁচু করে চীৎকার করে—তোগ গলা কাটমু।

মায়মুন বলে—হেই ছেঁড়ি। ঐ যে কোদালের মতন দাঁত। তোমার বউ।

মায়মুনের কথায় কান না দিয়ে শফী বলে—আইজ ব্যাডাগুলা বাড়ীতে নাই, থাকলে আমাগ গলাই কাইট্যা ফেলাইত রে।

কাছে এলে হাঁস দুটোকে কোষায় তুলে নিয়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে থাকে মায়মুন।

শফী কোষা বেয়ে বাড়ী যায়।

নিছক মশার কামড় ছাড়া আর কিছুই ছিল না হাসুর মুখে ! দু'দিন বাদেই রমজানের ব্যবস্থা মত সে কাজে লেগে যায়।

বিরাট জায়গা নিয়ে দালান উঠছে। হাসুর আনন্দ হয়। কারণ, অনেকদিন এখানে কাজ করা যাবে। এখানে কাজ বেশী। ইট ভেঙে সুরকি করা, ইটের বোঝা টানা, পানি তোলা এইসব কাজ করতে হয়। ভোর থেকে বিকেল পর্যন্ত খাটতে হয়। এক মুহূর্তও বসে কাটাবার উপায় নেই। কিন্তু তবুও হাসুর খারাপ লাগে না। স্টেশনে টো-টো করে ঘোরার চেয়ে এ কাজ অনেক ভালো। এখানে ইচ্ছে মত বোঝা নেওয়া যায়। কেউ ভারী বোঝা মাথায় চাপিয়ে দেয় না। কিন্তু স্টেশনের যাত্রী বাবু-সাহেবরা মাঝে

মাঝে এত ভারী বোঝা মাথায় চাপিয়ে দেয় যে ঘাড় ভেঙে যাবার উপক্রম হয়। স্টেশনে কাজেরও কোন ঠিকানা নেই, পয়সারও কোন ঠিক নেই।

বারো আনা পয়সা প্রায় দিনই হয়ে ওঠে না। কিন্তু এখানে একদিন কাজ করলেই বাঁধা এক টাকা। এক পয়সাও কম না। বন্ধুত্বের খাতিরে এক আনা করে সরদারি দিতে হয় না রমজানকে। স্টেশনের কাজে আরো কত ঝক-মারী। বাবুদের সাথে দরাদরি, ভিড় ঠেলে পথ চলা, সাঁতার কেটে স্টীমারে ওঠা, এইসব। এগুলো সহ্য হলেও নম্বরী কুলিদের অত্যাচার একেবারেই অসহ্য।

হাসুদের দলের সব ছেলেই এখানে কাজে যোগ দিয়েছে। হাসু শফীকে এনে এখানে কাজে ভর্তি করে দেয়।

শফী একদিন মা-কে বলে—মা তুমি আর খরাত কইর‍্য না। মাইনষে মন্দ কয়—

ছেলের মুখের কথা লুফে নিয়ে মাথা নেড়ে শফীর মা বলে—মাইনষে কয় খরাতনীর পুত? হেইয়াতে কি গায়ে ঠোয়া পড়ে? দশ-দুয়ার মাইগ্যা আইন্যা তোরে এতখানি ডাঙ্গর করছি।

জয়গুন বলে—পোলা তোমার উচিত কথাই কয় গো। ও অহন খাইডের বড় অইছে। রোজগারও করছে। ওর শরম লাগনের কতাই।

—ও রুজি-রোজগার করলে আর আমার ভাবনা কি! আমি খরাত করি কি আমার আমোদে? ঠ্যাঙ্গের জোরও গেছে। শরীলেও তাকত নাই। অহন সারাদিন এক ও'কৃত খাইয়া আর বইস্যা খোদার শুকুর ভেজতে পারলে বাঁচি।

বারো

বিকেল বেলা ঘুরে ঘুরে জয়গুন অনেক গন্ধভাদাল পাতা যোগাড় করে আনে। শহরের গিন্নীরা এ জংলী শাকের বড়া খেতে ভালোবাসে। পাতাগুলো শুকিয়ে ওঠে বলে রাত্রিবেলা ওগুলো সাজিয়ে ঘরের চালার ওপরে রেখে দেয়া হয়।

রাত্রির শিশির-ভেজা হয়ে ভোর বেলায় পাতাগুলো সতেজ ও সজীব হয়ে উঠে। রোদ উঠবার আগে জয়গুন চালার ওপর থেকে চাঙারিটা নামিয়ে নেয়। তারপর বসে বসে চার পয়সায় কতটা, তা আলাদা করে সে চাঙারির ভেতর সাজিয়ে নেয়।

খাওয়া সেরে জয়গুন তুষের হাড়ির থেকে আটটা ডিম নিয়ে গন্ধভাদাল পাতার মাঝে বসিয়ে দেয়। তারপর চাঙারিটা কাঁখে নিয়ে হাসু ও শফীর সাথে কোষায় এসে বসে।

সবুজ মাঠের মাঝ দিয়ে কোষা চলে। ধান খেতের দিকে চেয়ে জয়গুনের

চোখ জুড়ায়। নতুন শীষ মাথা বের করেছে। শীষের ভারে ঈষৎ নুয়ে পড়েছে ধানগাছগুলো। মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে বাতাস এসে সবুজ খেতে ঢেউ খেলিয়ে দিয়ে যায়।

জয়গুন বলে—এই বচ্ছর খোদায় দিলে ধান অইব খুব। আর না খাইয়া মরতাম না। এই সময় বিষ্টিডা রইয়া-সইয়া আইলে অয়। শীষমোখে বিষ্টি পাইলে বরবাদ অইয়া যাইব।

হাসু বলে—কেমুন মোট্টা মোট্টা ছড়া বাইর অইছে, ছাহ মা। বেবাক জায়গায় এইবার ভালা ধান অইব। উজান দেশেও হুনছি খুব বরান্দ ছাহা যায়।

—অউক। বরান্দ অইলেই খাইয়া বাঁচতে পারমু। এইবার পুরা ফসল না অইলেও, বারো আনা ফসল অইব, অহন যেই রহম ভাও-বরান্দ ছাহা যায়। গেল বচ্ছর আধা ফসলও অয় নাই।

শফীর হাতে লগি। সে একটা ধান-খেতের ভেতর কোষা চালাতেই জয়গুন বাধা দেয়—এই কি করস, শফী? এমন ভরা খেতের মইদ্যে দিয়া নাও বাইতে আছে?

—ক্যান? এইডা তো আর আমাগ খেত না।

অলক্ষী ছেঁড়ার কথা হোন। আমাগ খেত নাই বুইল্যা তুই অমন ফুলে-ভরা ধানের উপর দিয়া কোষা চালাবি? যা খাইয়া মানুষ বাঁচে, হেইয়া লইয়া খেলা! খেতের আইল দিয়া যা।

—আইল দিয়া গেলে কিস্তুক দেরী অইব।

—অউক দেরী। ধানের ছড়া বাইর অইছে। খেতের মাঝ দিয়া আর যাওন যাইব না। এট্টু টোক্কা লাগলেই কাইত অইয়া পড়ব, আর মাথা খাড়া করতে পারবো না।

শফী খেতের আল ধরে কোষা চালায়।

যে খেতে পাট ছিল সেগুলো কচুরীপানায় ছেয়ে গেছে। চার পাশের ধানখেতগুলোরও অনেকটা জায়গা গ্রাস করেছে কচুরী পানায়। কচুরীর ঝাড়ে বিচিত্র ফুলের মেলা।

দু'-একজন নিরলস কৃষক খেতের চারপাশে বাঁশের বেড়া দিয়ে কচুরী পানার আক্রমণ ঠেকিয়েছে।

দু'-একটা জলা-খেতে যেখানে কচুরী পানার উৎপাত নেই, সেখানে আধ-বোজা শাপলার ফুল। রোদের তেজ বাড়লে বুজে যাবে।

যেতে যেতে জয়গুন বলে—কয়েকটা শাপলা তুইল্যা লইয়া যাই উকিল বাবুর বউ হেদিন কইয়া দিছিল।

শাপলা তুলে গোটা কয়েক তাড়া বেঁধে নেয় জয়গুন।

একটা ট্রেন সবেমাত্র যাচ্ছে স্টেশন থেকে। হাসু ও শফী দৌড়ে গিয়ে চলতি গাড়ীর হাতল ধরে লাফিয়ে ওঠে পা-দানের ওপর। হাসু চেঁচিয়ে বলে তুমি ধীরে-হুস্তে আহ মা। আমরা গেলাম।

জয়গুন শাপলার তাড়া কয়টা কনুইর সাথে ঝুলিয়ে চাঙারি কাঁখে নারায়ণগঞ্জের দিকে যায়।

মসজিদের মৌলভী সাহেব আসছেন। তার মুখোমুখি হওয়ায় সঙ্কুচিত হয় জয়গুন। তার হাত দু'খানাই আটকা থাকায় সে মাথার কাপড়টাও টেনে দিতে পারে না। পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে যায় সে। আড়চোখে চেয়ে মৌলভী সাহেব অস্পষ্ট স্বরে বলে ওঠেন—তওবা, তওবা!

জয়গুনের প্রথম স্বামী জব্বর মুন্সী এই মৌলভী সাহেবের খুবই প্রিয়পাত্র ছিল। তার স্ত্রী সদর রাস্তায় হাঁটে তা তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না। কতবার লোক পাঠিয়ে তিনি জয়গুনকে বাইরে যেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু জয়গুন তো শোনেনি।

ডিম ও গন্ধভাদাল পাতা বেচতে বেশী সময় লাগে না। উকিল-পাড়ায়ই আজ সমস্ত কাবার হয়ে যায়। ঝাঁকা নামানো মাত্র চিলি-বিলি করে নিয়ে যায় সব।

জয়গুন বাজারে গিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় লবণ, মরিচ, গরীবের বিলাসদ্রব্য পান-সুপারি এবং আরো কয়েকটা প্রয়োজনীয় সওদা কেনে। রাস্তার এক জায়গায় আখ বিক্রি হচ্ছে। গাছের সাথে বাঁশ বেঁধে উচ্চতা ও দামের ক্রমানুসারে সারি সারি আখ সাজিয়ে রাখা হয়েছে। মায়মুন কতদিন মাকে বোম্বাই আখ নিতে বলেছে। কিন্তু সে ইচ্ছে করেই এতদিন নেয়নি, অযথা পয়সা খরচ হবে বলে। মায়মুনকে ফাঁকি দিয়ে সে বলেছে—উখের কি খায়? অহনো মিডা অয় নাই। পানসে উখ খাওয়ন আর ঘাস খাওয়ন সমান কথা।

কিন্তু আজ সারি সারি আখ দেখে তার মনে ব্যথা লাগে। সে ভাবে—মওসুমের একটা জিনিস কার না মুখে দিতে ইচ্ছে হয়? আর মায়মুন ত নেহায়েত কচি মেয়ে।

জয়গুন তিন আনা দিয়ে একটা আখ কেনে।

রাস্তায় রাজার মা-র সাথে দেখা হয়। রাজার মা জয়গুনের উত্তরে চাল কিনতে যাওয়ার সাথী। সে জিজ্ঞেস করে—কত দিয়া কিনলাগো উখখান?

—বারো পয়সা।

—বা—রো পয়সা!

রাজার মা মাথায় হাত দেয়। সে আবার বলে—তিন আঙ্গুল উখ না, দাম তিন আনা! উখত না—অষুধ। আস্তা পয়সা চাবাইয়া খাওয়ন।

—এই রহমই বইন। আমাগ ঘরের জিনিসের দর নাই। আমরা যা বেচতে যাই—হস্তা। এক্কেরে পানির দাম। বাজারে একটা আদনা চিজ কিনতে গিয়া ছ্যাহ, গাঁইটের পয়সায় কুল পাইবা না। একটু থেমে আবার বলে—এই চাঙারির এক চাঙারি শাক, এক্কেরে তরতাজা বেচলাম চাইর আনা। আর ছ্যাহ, আষ্ট আনার বেহাতি কোন্ নিচে পইড়্যা আছে।

—দেখছি বইন। এই দশা। এহন যাই গো। দেহি চাউলেরনি যোগাড় করতে পারি। আইজ গাড়ীতে ওঠতে পারলাম না। যা ভিড়! মাগ্ গো মা!

—পুরুষ মাইন্ষেই ওঠতে পারে না গাড়ীতে। আমরা ত মাইয়া মানুষ। কাইল পরশু আবার যাইবা নি গো? গেলে লইয়া যাইও আমারে। ছ্যাশের চাউলে প্যাট ভরে না। চাউলের দাম যেন রোজ রোজ ওঠতেই আছে।

রাজার মা এতক্ষণে কয়েক পা এগিয়ে গেছে। জয়গুন হাঁটতে হাঁটতে ভাবে, আর বুঝি উত্তরে যাওয়া হয় না। লোকের ভিড়ে গাড়ীতে উঠবার যো নেই। কত লোক হাতল দরে পা-দানের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। গাড়ীর ছাতে বসে যায় কত লোক। সেদিন তার চোখের সামনে একটা লোক গাড়ীর পা-দানের ওপর থেকে পড়ে গেল।

টিকিটের জন্যেও আবার খুব কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। বিনা টিকিটে লুকিয়ে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সয়ে আর কত দিন যাওয়া যায়? জয়গুনদের গ্রামের জহিরুদ্দিন বিনা টিকিটে গাড়ী চড়ায় তিনদিন ফাটক খেটে এসেছে।

পথে আসতে একটা উদলা নৌকার ওপর জয়গুনের দৃষ্টি পড়ে। রেল-রাস্তার পাশে গাছের সাথে বাঁধা ছোট নৌকাটি। একটি ছোট ছেলে বসে আছে নৌকার ওপর। যে কোন ছোট ছেলে হাতের কাছে পেলেই সে কোলে তুলে নেয়। তার মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে। কাসুর নাক, কাসুর চোখ, তার কপাল, ভ্রুযুগল গায়ের রঙ কেমন ছিল আজও জয়গুনের চোখের সামনে ভাসে। কারও ছোট ছেলে কোলে নিয়ে তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে মন্তব্য করে—ওর নাকটা আমার কাসুর নাকের মতন। আমার কাসুরও এই রহম জোড়-ভুরু। জোড় ভুরু ভাইগ্যমানের লক্ষণ। কিন্তু অইলে কি অইব? যে দশ মাস দশ দিন উদরে রাখল, তার বুক খালি।

একটা নিশ্বাস ছেড়ে সে আবার বলে—থাক আমি শাপ দিমু না কাউরে। আমার কাসু জান-ছালামতে বাঁইচ্যা থাউক—খোদার কাছে দিন-রাইত চব্বিশ ঘণ্টা এইডাই আরজ করি।

নৌকায় বসা ছেলেটার দিকে চেয়ে জয়গুনের মনে হয় তার কাসুও এতদিনে হয়ত এতটা বড় হয়েছে।

নৌকাটার দিকে আর একবার চেয়ে দেখে জয়গুন। এ রকম একটা নৌকা করিম বক্শেরও ছিল। নৌকার মাঝে একটা কোঁচও দেখা যায় ঠিক করিম বক্শের কোঁচটার মতই। সে ভালো করে দেখে। তাইত! করিম বক্শের কোঁচটাই। কোন ভুল নাই।

জয়গুন থমকে দাঁড়ায়। তার মনে আনন্দ ও আবেগের মিলন-সংঘাত আবর্তের সৃষ্টি করে। সে ভুলে যায়, আসমানে না জমিনে, স্বপ্নে না জাগরণে কোথায় কোন অবস্থায় সে আছে।

মুহূর্ত পরে নিজেকে সামলে নিয়ে কাঁখের ঝাঁকাটা রাস্তার ওপর ফেলে সে নৌকার দিকে ছুটে যায়।

নৌকায় পা দিতেই ছেলেটি বলে—উইট্য না আমাগ নায়।

জয়গুন উত্তর না দিয়ে নৌকায় ওঠে।

ছেলেটি বলে—ক্যাদা মাইখ্যা দিলা যে! বা'জান আমারে মারব।

জয়গুনের খেয়াল নেই। সে কাদা পায়েই উঠে পড়েছে।

জয়গুন ছেলেটির কাছে গিয়ে বসে। তার চিবুক ধরে বলে—তোমার নাম কি?

ছেলেটি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে তার দিকে। মুখ না নামিয়ে আস্তে বলে—কাসু।

—কাসু! কাসু! আমার কাসু! জয়গুন পাগল হয়ে গেল বুঝি। সে দুই হাতে কাসুকে জড়িয়ে ধরতে যায়। কাসু সে হাত সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে।

জয়গুন ভাবে—আজ সে পেটের সন্তানের কাছে পর হয়ে গেছে।

জয়গুন কাসুকে কোলে নেয়। কিন্তু কাসু কোস্তাকুস্তি করে কোল থেকে নেমে যায়।

জয়গুন আখ খেতে দেয় কাসুকে। নিজের দাঁত দিয়ে চোকলা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুক্‌বো করে তার মুখে দেয়। কাসু চিবোয়। জয়গুন অশেষ তৃপ্তির সাথে তার দিকে চেয়ে দেখে।

এক সময়ে জয়গুন বলে—তোমার বা'জান কই?

—দুধ বেচতে গেছে।

—তোমার মুখখানা হুকনা যে? তোমার মায় তোমারে খাইতে দেয় নাই?

—আমার মা নাই, মইর‍্যা গ্যাছে।

জয়গুন সহ্য করতে পারে না। সে তাকে কোলে তুলে নেয়। আখ খেতে দেয়ায় কাসু বশ হয়েছে। এবার সে কোলে উঠতে আপত্তি করে না। জয়গুন পরম স্নেহে তার কপালে চুম্বন করতে থাকে। তার চোখের পানি কাসুর মুখখানা সিক্ত করে দেয়।

কাসুকে কোলে নিয়ে জয়গুনের অনেক সময় কাটে। করিম বক্শ দুধের হাঁড়ি মাথায় নৌকার কাছে এসে কখন দাঁড়িয়ে আছে জয়গুনের হুঁশ নেই। করিম বক্শের ডাকে তার আবেশ ভেঙে যায়। মুখ তুলে দেখে—করিম বক্শ। তার চোখ দুটো রাঙা—জ্বলছে।

জয়গুন মাথার কাপড় আরো টেনে দিয়ে দাঁড়ায়। নৌকা থেকে নেমে শিথিল বিবশ পা দুটোয় স্বাভাবিক শক্তি ফিরিয়ে আনবার আগেই করিম বক্শের গম্ভীর গলা শোনা যায়—খাড়, কথা আছে।

জয়গুন দাঁড়ায়। করিম বক্শ বলে—আমারে আর সুখে-শান্তিতে থাকতে দিবি না, দেখতে আছি। মায়ে-পুতে জোট কইর‍্যা আমারে পাগল বানাইয়া ছাড়বি তোরা। হাসুয়া হারামজাদা কদ্দিন জ্বালাইছে, আবার তুইও—

জয়গুন নীরব।

—আমার সুখ তোগ চউখে সয় না? সাত সাতটা বচ্ছর দুধ ভাত খাওয়াইয়া ওরে অত ডাঙ্গর করছি। এহন চাও তৈয়ার আণ্ডায় উম দিতে।

জয়গুনের ইচ্ছে হয় বলে—আণ্ডা তুমি পাড় নাই। আমার আণ্ডায় আমি উম দিলে তোমার এত পোড়ানি কিয়ের লেইগ্যা? ওরে দশ মাস দশ দিন পেডে রাখছি, তিন বচ্ছর বুকের দুধ খাওয়াইছি। তুমিই তৈয়ার আণ্ডায়—

কিন্তু মুখ ফুটে একটি কথাও সে বলতে পারে না।

করিম বক্শ আবার বলে—তোগ ডরে ওরে বাড়ীতে রাইখ্যা আহি না। লেজুড়ে লেজুড়ে বাইন্দা রাখি সব সময়। নাওডা চোরে লইয়া যায় এই ডরে ওরে নায় বহাইয়া বাজারে যাই। এদিগেও তোগ উৎপাত শুরু অইছে! আমি এহন কোথায় যাই? তোগ যন্তন্নায় মুল্লুক ছাইড়্যা বনবাসে গেলে পারি অহন।—করিম বক্শ গুমরে ওঠে।

জয়গুন চলতে আরম্ভ করে।

করিম বক্শ বলেই চলে—দোহাই খোদার! ওরে ফুসলি দিস্ না আর। আমার পোলারে ফুসলি দিলে আল্লার কাছে ঠেকা থাকবি। রোজ কেয়ামত তক্ দাবী থাকবো তোর উপরে।

জয়গুন বেশ কিছু দূর এগিয়ে গেছে।

করিম বক্শ জোরে বলে—আবার যদি ফেউ-এর মতন আমার পিছু লাগস্, আখেরী কথা হুনাইয়া দিলাম, তয় তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

জয়গুন কোনও দিন কাসুকে ফুসলি দেয়নি, আর দেবেও না—সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে।

তেরো

মেয়ে লোকটি কে ?

কাসুর মনে বারবার এই প্রশ্নটাই আনাগোনা করতে থাকে।

তাকে কোলে নিয়ে কত আদর করলো! আখ খেতে দিলো দর্ দর্ করে পানি পড়ছিল তার চোখ বেয়ে। কে সে ?

একবার তার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু করিম বক্শের মুখ-চোখের দিকে চেয়ে প্রশ্নটা চাপা পড়ে যায়।

করিম বক্শের রাগ তখনও থামেনি। জয়গুন সে রাগ থেকে কোন রকমে বেঁচে গিয়েছিল। একত্র ঘর-সংসার করার পুরাতন স্মৃতি করিম বক্শের মেজাজকে চরমে উঠতে দেয়নি। কিন্তু তারপর লগির উপর দিয়ে তার রাগের জের চলে সমানভাবে। লগির জোর গুঁতোয় ধানখেতের মাঝ দিয়ে যেন তীরের মত ছুটছিল তার ডিঙ্গি। ডিঙ্গির গলুইয়ে পানি উঠছিল ছলাৎ, ছলাৎ! কিন্তু বাড়ীর কাছাকাছি এসে লগিটা মটাৎ করে ভেঙে দু'ভাগ হয়ে যায়। করিম বক্শের রাগ কিন্তু এতক্ষণে থামে। লগি ভাঙার আফসোসে নয়, তার রাগের জয়লাভে। তার রাগ জয়ী হয়েছে লগিটা ভেঙে দিয়ে। এমনি কোন মাশুল না পেলে তার রাগের কোন মতেই শান্তি আসে না। লগিটা না ভাঙলে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে আঞ্জুমনের সাথে খুব এক চোট ঝগড়া হওয়ার সম্ভাবনা হয়ত ছিল।

বাপের থমথমে মুখের দিকে চেয়ে কাসুর কথা বলবার সাহস হয় না। চুপ করে সে বসেই থাকে আর ভাবে—মেয়ে লোকটি কে হতে পারে ?

প্রশ্নটার মীমাংসায় সেদিন থেকে সে অনেকটা সময় নিয়োজিত করেছে। কিন্তু তার কাঁচা মাথা কোন সন্তোষজনক হদিস খুঁজে বার করতে পারেনি।

হদিস শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়।

আঞ্জুমন একদিন হাশরের ময়দানের কিচ্ছা বলছিল। শুনে কাসু হঠাৎ জিজ্ঞেস করে—হাশরের ময়দানে এত মাইনষের মধ্যে মা-রে চিনতে পারা যাইব ? আমি ত মা-রে দেহি নাই। তুমি মা-রে চিনাইয়া দিবা ?

আঞ্জুমন কাসুর অভিলাষ বুঝতে পেরে ব্যথিত হয়। কাসুর প্রশ্নটা তাকে খুব পীড়া দিতে আরম্ভ করে আজ। সে ভাবে—কাসুকে এমন করে মিথ্যার জালে জড়িয়ে রাখার কোন অর্থ হয় না। অন্তত তার তো কোনই লাভ নেই লোকসান ছাড়া। কাসু ওর মা-র কাছে চলে গেলেই ভালো হয় যেন। করিম বক্শ ফুলিকে মোটেই আদর করে না। এমন কি বা'জান বা'জান বলে কেঁদে খুন হয়ে গেলেও কোলে তুলে নেয় না। আরো গালাগাল দেয়—

মেঙ্কুরের বাচ্চাডা কান্দে ক্যা? এইডারে ছালা ভইর‍্যা জঙ্গলে ফালাইয়া দিয়া আয়। কাসুই করিম বক্শের কাছে সব। ফুলি যেন তার কেউ নয়।

ভাবতে ভাবতে তার মন বিরক্তিতে ভরে ওঠে। সে স্থির করে—আজ কাসুকে ওর মা-র কথা বলে দেবে। জয়গুনের বাড়ী দেখিয়ে দেবে কাসুকে। করিম বক্শের ইঙ্গিতে সে এতদিন কাসুকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে রেখেছিল। মা-র কথা জিজ্ঞেস করলে তাকে সাজিয়ে বলতে হতো অনেক কথা। কাসু একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, তার মা-র কবরের কথা। আঞ্জুমন কোন দ্বিধা না করে মেহেরণের কবরটাই দেখিয়ে বলেছিল—এই যে এইডা তোর মা-র কবর।

কাসু বিশ্বাস করেছিল, নিশ্বাস ফেলেছিল আর চেয়েছিল একদৃষ্টে কবরটার দিকে।

মা-র কথা শুনতে শুনতে সে তন্ময় হয়ে যেত। আর ভাবত আহা—মা থাকা কত সুখের! সঙ্গে সঙ্গে তার মনে জাগত সমবয়সীদের কথা। হামিদের মা হামিদকে কত স্নেহ করে। সেলিমের মা কত আদর করে সেলিমকে। কিন্তু তাকে আদর করবার কেউ নেই।

তারপর থেকে সে প্রায়ই কবরটাকে দেখতে আসতো। মাঝে মাঝে করিম বক্শের কাছ থেকে পয়সা চেয়ে মোমবাতি কিনে কবরে দিত।

আঞ্জুমন এবার বলে—আমি একটা কথা কইতে পারি। কেওর কাছে না কইতে পারস?

কাসু মাথা নাড়ে।

—খবরদার, তোর বা'জান হোন্‌লে আমারে কাইট্যা দুই খণ্ড কইর‍্যা ফ্যালাইব। তয় হোন্। অই কবরডা তোর সতাই মা-র! আমি যেমুন সতাই মা, তেমুন।

—কে আমার মা? কাসু উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তুমিই ত কইছিলা ওইডা আমার মা-র কবর।

—ওহোঁ, মিছা কথা। তোর মা অহনো বাঁইচ্যা আছে।

কাসু বিশ্বাস করতে পারে না। সে বলে ফাঁট্‌কি ছাও তুমি।

—ফাঁট্‌কি দিমু ক্যা? বিশ্বাস না করলে আর কইমু না। থাউক।

আঞ্জুমন চুপ করে।

কিন্তু কাসুর শোনবার আগ্রহ এবার বেড়ে যায়। সে বলে, আইচ্ছা. এইবার বিশ্বাস করমু, কও তুমি।

—কইলে কি দিবি আমারে?

—তুমি যা চাও হেইয়া দিমু।

—আমি চাই :

আসমানী বিরিক্ষর ফল,
তল নাই দীঘির জল,
যা খাইলে হয় অসুরের বল। পারবি দিতে?

কাসু বিপদে পড়ে। কোথায় পাবে সে এসব? আসমানে গাছ হয়, সেই গাছে ফল হয়। কি তার নাম? সে বুঝতেই পারে না কিছু। আর তল নাই দীঘি—সেটাই বা কেমন? হতাশায় কাসুর মুখ অন্ধকার হয়ে যায়। তার ধারণা এগুলো দিতে না পাবলে তার সৎমা তাকে তার মা-র কথা বলবেই না।

আঞ্জুমন খলখলিয়ে হেসে ওঠে। কাসুর পিঠ চাপড়ায়। কাসু এবার ভরসা পায়।

আঞ্জুমন আরম্ভ করে—তোর বয়স তহন তিন বচ্ছর। তোর বাপ তোর মা-রে ছাইড়্যা দেয়। তোরে তোর ফুফুর কাছে পাডাইয়া ছায়। তোর একটা বইন আছে, মায়মুন তার নাম।

কাসুর সন্দেহ দূর হয় না। কিন্তু সে মনোযোগ দিয়ে শোনে সব কথা।

আঞ্জুমন আবার বলে—ঈদে টুপিখান দিছিল কে? তোর মা দিছিল না? অই যে কানা বুড়ি দিয়া গেল, ওই কানা বুড়ি তোর মামানি।

কাসুর সমস্ত সন্দেহের অবসান হয় এবার। সৎমায়ের আচরণে কাসু কোন দিনই সদিচ্ছার পরিচয় পায়নি। তার হাব-ভাব দেখলে তার ভয়ই হতো। আজ সৎমায়ের মমতায় সে বিস্মিত হয়। তাকে খুব ভালো লাগে। আঁচল ধরে আবদার করতেও এখন বাধে না কাসুর।

সে বলে—যাইমু মা-র কাছে। আমারে লইয়া যাও না মা-র কাছে।

—আমি লইয়া যাইমু কোতায়? সবনাশ! তোর বা'জান জানতে পারলে আমারে মাইর‍্যা কাইট্যা গাঙে ফ্যালাইয়া দিব! খবরদার! জানতে যেন্ না পারে।

কাসু মাথা নাড়ে।

আঞ্জুমন বলে—চল্, তোরে দেহাইয়া দেই। বাড়ীর উত্তর ধারে গেলে ছাহা যায় বাড়ীখান।

কাসুকে নিয়ে আঞ্জুমন বাড়ীর উত্তর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

সূর্য-দীঘল বাড়ীর তালগাছটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সে বলে—ওই যে দুইখান বাড়ীর ফাঁক দিয়া ছাহা যায় একটা বড় তালগাছ। ওই বাড়ীডা, অই হানেই থাকে তোর মা।

কাসু পলকহীন দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তার মন এই মুহূর্তে ছুটে যেতে চায়। কিন্তু নিচে মাঠের দিকে চেয়ে নিরুপায় বলে মনে হয় নিজেকে। আশ্বিনের শেষাশেষি, পানি শুকিয়ে আসছে। জমির উঁচু আল

দেখা যায়। সমস্ত মাঠ কাদায় দৈ-দৈ হয়ে আছে। পায়ের পথও নয়, নায়ের পথও নয়।

করিম বক্‌শ যখন বাড়ী থাকে না, তখন কাসু প্রায়ই বাড়ীর উত্তর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। নৌকার মাঝে দেখা মা-র মুখখানা চিন্তা করে।

এখান থেকে তালগাছটা স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু মাঠের কাদা আর পানি কাসুর সাথে আড়ি ধরেছে যেন। রোজ এখানে এসে এসে তার রাগ ধরে পানির ওপর। কেন পানি শুকাতে দেরী করছে এত?

দু'একটা লোককে কাদা ভেঙে পথ চল্‌তে দেখে তার মনে হয়, সে যদি একটু বড় হতো, তবে সে-ও যেতে পারত অনায়াসে। মাঝে মাঝে কারো কাঁধে চড়ে যাওয়ার ইচ্ছে হয় তার। কিন্তু কে এমন দরদী যে তাকে কাঁধে করে নেবে?

তালগাছটার দিকে দু'একটা পাখীকে উড়ে যেতে দেখে তারও উড়বার স্পৃহা জাগে। ঐ পাখীগুলোর মত দুটো পাখা যদি তার থাকত।

মাঠের কাদা যতই শুকিয়ে আসতে থাকে, কাসুর মনও ততই উড়ু উড়ু করতে থাকে। কার্তিক মাসের শেষে মাঠের মাঝে পথ পড়ে। এমনি সময়ে একদিন শফীর মা আসে এ বাড়ীতে। কাসুর আনন্দ আর ধরে না। এ রকমই একটা সুযোগের অপেক্ষা করছিল সে।

এক প্রহর বেলা। করিম বক্‌শ গোয়াল থেকে গাইটা বের করে উঠানে কাঁঠাল গাছের সাথে বাঁধে। আঞ্জুমন ঝিনুকে করে সর্ষের তেল এগিয়ে দেয়।

করিম বক্‌শ হুকুম করে— হাম্বাডা লইয়া আয়। বাজারের বেইল অইয়া গেছে।

— আমার ঘিন্ করে। তুমিই যাও।

করিম বক্‌শ গোয়ালের এক পাশে ঝুলানো হাম্বাটা নিয়ে আসে।

গাইটার বাছুর মরেছে অনেক দিন। দুধ-চোর গাই বাছুর না দেখলে দুধ ছাড়ে না। কোথায় লুকিয়ে রাখে। বাছুর না দেখলে বাঁটে হাত দেওয়াও মুস্কিল। ঠ্যাং দিয়ে লাথি মারে। এসব অসুবিধার জন্যে এই অদ্ভুত ব্যবস্থা। মরা বাছুরটার চামড়ার খোলসে খড়-বিচালি ভরে নকল বাছুর তৈরী করা হয়েছে।

করিম বক্‌শ হাতে সর্ষের তেল নিয়ে বাঁটে মাখিয়ে দেয়। তারপর নকল বাছুরটার মুখ বাটের কাছে নিয়ে বাছুরের অনুকরণে গুঁতো মারে। এ রকম করলে যখন বাঁটে দুধ নেমে আসে, তখন দুই হাঁটুর মাঝে হাঁড়ি রেখে করিম বক্‌শ দুইতে আরম্ভ করে।

—বাছুর কবে মরল ভাই?

করিম বক্‌শ চেয়ে দেখে—শফীর মা। নিতান্ত অনিচ্ছার সাথেই সে উত্তর দেয় - মাস তিনেক অইল।

—অনেক দিন ত অইল। কেমুন কইর‍্যা মরল? দুধে পানি মিশাও বুঝিন? দুধে পানি মিশাইলে বাছুর মইর‍্যা যায়। এইডা হাচা কতা। শফীর মা ঠাট্টার সুরে বলে।

জয়গুন করিম বক্‌শের সংসারে থাকতে এ রকম ঠাট্টা-মশকরা প্রায়ই চল্‌ত তাদের মধ্যে। বহুদিন বহু ঘটনার তিক্ততার পরেও আজ কেমন করে যে এ ঠাট্টাটুকু জিভ থেকে পিছলে বেরুল, শফীর মা নিজেই বুঝতে পারে না। কথাটা বলেই সে লজ্জিত হয়। করিম বক্‌শ আপন মনে এ-বাঁট থেকে ও-বাঁটে হাত চালিয়ে দুধ নামাতে থাকে। তার মুখেও ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায়।

গাইটা নিষ্প্রাণ নিস্পন্দ নকল বাছুরটার গা চাট্‌তে থাকে শুধু শুধু।

আঞ্জুমন পিঁড়ে এনে বসতে দেয় শফীর মা-কে। শফীর মা-র কথার উত্তর সে-ই দেয় এবার--পানি মিশাইব কোন্ দুক্‌খে? পানি মিশান বোধ করি ভালা আছিল্। বাছুররে দুধ খাইতে না দিলে বাঁচব কেমন কইর‍্যা, কও? ঘাস না চিনতেই দুধের বাছুরের সামনে দিয়া রাখত ঘাস। আর সমস্ত দিন ভ্যা-ভ্যা করত বাছুরডা। বাছুররে দুধ খাইতে দিলে যে আঁড়ি উনা থাকে, বোঝলা নি বইন?

করিম বক্‌শ খেঁকিয়ে ওঠে—থাম্ মাগী, বেজাত। কুডুমের কাছে বিত্তান্ত শুরু করছে। বেশী বকর-বকর করলে দুধের আঁড়িডা তোর মাথার ’পর ভাঙমু, কইয়া রাখলাম।

শফীর মা বলে—থাউক, বিহান বেলা কইজ্যা কইর‍্য না গো তোমরা। হাম্বাডা কিন্তু খুব ঢক-সই অইছে। আমি তো ভাবছিলাম জিয়ন্ত বাছুরই। কে বানাইছে? মায়মুনের বাপ, তুমি?

অনেকদিন পরে ‘মায়মুনের বাপ’ ডাকটা শুনে চমকে ওঠে করিম বক্‌শ। শফীর মা এই বলেই তাকে ডাক্‌ত। এ পাড়ার সবাই ডাকে ‘রহির বাপ’ বলে। আঞ্জুমনের বাপের বাড়ীতে ডাকে ‘ফুলির বাপ’। শেষের দুটোই চলছে আজকাল। আগের নামটা ঘুমিয়ে গেছে তার মনে। করিম বক্‌শ মাথা নাড়ে।

—হ। কারিগরিতে, তোমার মত ওস্তাদ আর নাই এই আশে-পাশে। করিম বক্‌শের দুধ দোহন শেষ হয়েছে। শফীর মা-কে কথা বলবার অবসর না দিয়ে সে দুধের হাঁড়ি হাতে উঠে পড়ে।

শফীর মা বলে—আদত কথাডা হোন এইবার। তোমার কাছে আইছি একটা কথা লইয়া।

করিম বক্‌শ দাঁড়ায়। বলে—কি কতা?

—মায়মুনের সম্বন্ধ ঠিক অইছে। আমি কত চেষ্টা-তদবির কইর‍্যা তয় ঠিক করলাম। না অইলে এমুন সম্বন্ধ কপাল কুটলেও জুটত না।

—কোথায় সম্বন্ধ !

—সোলেমানের পোলা, সদাগর খাঁর নাতি ওসমানের লগে।

—কবে বিয়া ?

—এই মাসের এই কয়দিন পর। অগ্রাণ মাসের নয় তারিখ। তোমার কিন্তু যাইতে অইব।

—আমি যাইতে পারতাম না।

—এ তুমি কেমুন কথা কও ! তোমার মাইয়া, তুমি না গেলে চলব কেমনে ?

তোমার মাইয়া !

করিম বক্শের মনের দুয়ারে ধাক্কা খেয়ে বারবার প্রতিধ্বনি করে কথা দুটি। কিন্তু ঊষর মনে বারিপাতের চেষ্টা বৃথা। কাসুকে ফুসলি দেয়ার ষড়যন্ত্রের কথা মনের ভেতর টেনে এনে সে নিজেকে কঠিনতর করে তোলে। এবার স্বরটা কঠিন করেই সে বলে—যেদিন থেইকা ওগ বিদায় দিছি, হেদিন থেইকা ওরা আমার কেউ না।

—তুমি কি কও ভাই ! তোমার মাইয়া, তুমি না গেলে কেমুন ছাহা যায় ? কাসুও যাইব তোমার লগে।

—কাসু যাইব !

—হ্যাঁ, দোষ কি ? আবার তোমার লগেই লইয়া আইবা।

—বাহার কথা কইছ ! কেউ যাইব না। কাসু যাইব না, বাড়ীর একটা পোনাও যাইব না।

কাসু এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল। আঞ্জুমনের ইশারায় এবার সে চুপি চুপি সরে যায়।

—কেউ না ? শফীর মা আবার বলে।

—হ, হ, কেউ না। বিয়া দিয়া ছ্যাও, চাই কাইট্যা গাঙ্গে ভাসাইয়া ছ্যাও, হেতে আমার কি ? আমি হুঁ-হাঁ কিছু কইমু না।

শফীর মা আর কথা বাড়াবাড়ি করতে সাহস করে না। সে আগেই জানত, মায়মুনের বিয়েতে করিম বক্শকে পাওয়া যাবে না। তবু সে এসেছিল যাতে পরে দুষতে না পারে।

পাশ থেকে কঞ্চির লাঠিটা হাতে নিয়ে শফীর মা ওঠে।

আঞ্জুমন বলে—পান-খাইলা না বইন ?

—নালো বইন। আমি আবার বিনে ছেঁচা মোখে দিতে পারি না। ছেঁচতে দেরী অইয়া যাইব।

শফীর মা পথ নেয়।

খেতের আলের ওপর কাসু দাঁড়িয়ে আছে। শফীর মা যেতেই তার একখানা হাত ধরে সে বলে—আমি যাইমু, মামানী।

—আমি তোর মামানী, কে কইছে ?

—আমি হুনছি।

কাসু আবার বলে—আমি যাইমু, তোমার লগে।

—কই যাবি ?

কাসু কোন উত্তর দেয় না।

শফীর মা বলে—নারে বা'জান। তোরে নিলে আমি দোষের ভাগী অইমু। শিগগীর বাড়ীতে যা। তোর বাপ মাইর‍্যা খুন কইর‍্যা ফ্যালাইব।

—উঁহুঁ, জানতে পারব না। বা'জান দুধ বেচতে যাইব।

—ফুলির মা কইয়া দিব তোব বা'জানের কাছে।

—ওহোঁ, কইব না। হেই ত আমারে চিনাইয়া দিছে ঐ তালগাইছ্যা বাড়ীডা।

শফীর মা একটু চিন্তা করে বলে—আইচ্ছা চল্। আবার তাড়াতাড়ি ফির‍্যা আইতে অইব। তোর বাপ জান্‌তে পারলে কিল এট্টাও জমিনে পড়ব না।

কাসু বলে—বাজার তন ফিরতে দেরী অইব। তার আগেই ফির‍্যা আইমু আমি।

শফীর মা-কে পেছনে ফেলে কাসু এগিয়ে যায়। শফীর মা-ও জোরে পা ফেলে। কিন্তু কাসুর সাথে সে হেঁটে পারে না। সে কতদূর এগোয়, আবার পেছনে ফিরে তাকায়।

করিম বক্‌শের বাড়ী ছাড়িয়ে অনেক দূর এসে পড়েছে তারা। এবার পেছন দিকে তাকাতেই শফীর মা দেখতে পায়—করিম বক্‌শ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে এদিকে। কোণাকুণি ধানখেত মই দিয়ে যেন আসছে সে। কাসু শফীর মা-কে ছাড়িয়ে নল খানেক এগিয়ে গিয়েছিল।

শফীর মা ডাকে—কাসু ! ভয়ে তার গলা দিয়ে আর কথা বেরোয় না।

কাসু পেছন দিকে তাকিয়ে 'থ' হয়ে যায়।

শফীর মা বলে—ভালা চাস্‌ত বাড়ীমুহী পথ দে। নইলে আড্ডি গুড়া কইর‍্যা ফ্যালাইব।

কাসু এসে শফীর মা-কে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে। তারা দু'জনেই ভয়ে কাঁপতে থাকে। শফীর মা-র কাঁপুনি অনুভব করতে পেরে তার ভয় আরো বেড়ে যায়।

করিম বক্‌শ এসে পড়েছে। দুই হাতে কাসুকে ধরতেই সে আর্ত-চীৎকার করে উঠে। সে শফীর মা-র আঁচল জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু করিম বক্‌শ তার রাক্ষুসে থাবায় ছাড়িয়ে নেয় কাসুকে। শফীর মা-কে ধাক্কা মেরে বলে—তুই মাইয়ালোক। নইলে আইজ—

রাগের অতিশয্যে করিম বক্‌শের মুখ দিয়ে কথার শেষটা বের হয় না।

এবার সে কাসুকে বাম কাঁধে ফেলে, ডান হাত দিয়ে এক একটা থাপ্পড় মারে আর বলে – আর এই মুখি পাও ফেলবি? ছ্যাথ, কেমুন মজা!

কাসু কাঁধের ওপর থেকেই হাত পা ছুঁড়ে চীৎকার করতে থাকে।

করিম বক্শের ধাক্কা খেয়ে শফীর মা বসে পড়েছিল মাটির ওপর। সে অবস্থায়ই সে জিরিয়ে নেয় আর চেয়ে দেখে করিম বক্শের কাণ্ড।

কিছু দূর যাওয়ার পর আর করিম বক্শকে দেখা যায় না। ধানখেতের আড়ালে পড়ে গেছে সে এখন। সোজা হয়ে দাঁড়ালে করিম বক্শের কীর্তি দেখা যেত। কিন্তু শফীর মা তখনও বসে হাঁপাচ্ছে।

চৌদ্দ

৯ই অগ্রহায়ণ। আজ মায়মুনের বিয়ে। লতিফ মিয়ার বাড়ী গিয়ে এই শুভ দিনটি জেনে এসেছিল শফীর মা।

লতিফ মিয়া তার পকেট পঞ্জিকা বের করে। একটা পাতার ওপর নজর দিয়ে সে আপন মনেই বলে—চন্দ্র রাজা বুধ মন্ত্রী। তারপর শুভকার্যের নির্ঘণ্ট দেখে বলে দেয়—অগ্রাণ মাসের ৯ তারিখে একটা শুভদিন আছে। আর একটা আছে শেষাশেষি—২৭ তারিখ। এছাড়া অগ্রাণ মাসে আর দিন নেই।

লতিফ মিয়া তার পঞ্জিকা বন্ধ করে। পঞ্জিকার ওপরের রাশিচক্র অঙ্কিত মলাটের দিকে তাকিয়ে লতিফ মিয়ার গণনায় শফীর মা-র একটু সন্দেহও আসে না। সে ভাবে—এমন বই-এর গণনা কখনও ভুল হতে পারে না। লতিফ মিয়াকে দাওয়াত করে শফীর মা বিদায় হয়। পথে আসতে আসতে সে শুভদিনটি মনে মনে ইয়াদ করে।

গণনা নির্ভুল সন্দেহ নেই। কারণ, এই তারিখে আশেপাশে আরো অনেক বাড়ীতে বিয়ের ধুম লেগেছে। গাঁয়ের জমিদার বাড়ীতেও আজ বিয়ে। বাজারে দুধ কিন্‌তে গিয়ে তা টের পাওয়া যায়। দুধের সের ছয় আনা থেকে বেড়ে এক টাকা হয়। মাছের দর চড়ে হয় দ্বিগুণ। বাজারের অর্ধেক দুধ, ঝাঁকায় ঝাঁকায় বাছা-বাছা রুই কাতলা মাছ যায় জমিদার বাড়ী।

হাসু ও শফী আসে বিয়ের বাজার করতে। চার সের দুধ, দুটো শোল মাছ, দুটো লাউ আর চাল-ডাল এবং আরো কিছু সওদা নিয়ে তারা বাড়ী আসে।

বাজার ফেরৎ তিন টাকা ও কয়েক আনা হাসু মা-র কাছে ফেরৎ দেয়।

জয়গুন বলে—বারো ট্যাকা যে খতম করলি, আরো ত অনেক খরচ আছে।

শফীর মা বলে—থুইয়া ছ্যাও। অত হত দরকার নাই। পনেরো ট্যাকা দিছে মোট্টে। ওয়াগ ট্যাকা দিয়া ওয়াগ খাওয়াইমু। আমরা খরচ করতে যাইমু কোন্ দুক্খে?

—গোশ্ত অইলে ভালা আইত।

থুইয়া দে, আবার গোশ্ত! আরো পাঁচখান ট্যাকা দিবার কইছিলাম, হেইয়া দিল না, কিরপিন।

—দিছে পনেরো ট্যাকা। আইব ত ভেড়ার পালের একপাল।

—আহনের কতা দশ জনের। কয়জন আহে, আল্লা মালুম।

—তাইত আমি আগেই কইছিলাম, মায়মুনের বিয়াতে ট্যাকা নিমু না। পান-সরবত খাওয়াইয়া বিদায় করমু।

—হেইডা ভালা আছিল।

—কিন্তু কেও হোন্‌লা না আমার কথা। অহন ট্যাকা নিয়া বদনামের ভাগী অই।

—তুমি কিছু চিন্তা কইর্য্য না, হাসুর মা। শইল মাছ আর কদু দিয়া একটা ঘণ্ড, ডাইল আর দুধ-বাতাসা, ব্যস! আবার কি! এ খাইয়া তোর বেয়াই সোলেমান খাঁ তার বউর কাছে গপ্প ছাড়বো! তারিফ করবো তোর রান্দার।

জয়গুনের হাসি পায়।

নওশা আসবে সন্ধ্যার পরে। বিকেল বেলায় হাসু ও শফী পাড়ার থেকে হোগলা যোগাড় করে এনে পেতে দেয় অতিথিদের বসবার জন্যে। উঠানের এক পাশে পা ধোয়ার জন্যে পানি ভরা কলসী ও বদনা রেখে দেয়। তার পাশে রাখে জলচৌকি ও খড়ম।

সময়টা ভালো। বৃষ্টি-বাদলের ভয় নেই।

সন্ধ্যার পর বরযাত্রীরা আসে। দুলাও আর সকলের মত পায়ে হেঁটেই আসে। গরীবের বিয়েতে পাল্কীর কথা কেউ কল্পনা করতেও পারে না। পাল্কীর ভাড়ায় একটা পুরো দস্তুর বিয়ে স্বচ্ছন্দে হয়ে যেতে পারে।

বেড়ার ফাঁক দিয়ে জয়গুন জামাই দেখে নেয়। গোলাপী মাদ্রাজী লুঙ্গী পরণে, গায়ে বেগুনী রঙের পাঞ্জাবী আব মাথায় লালটুপি। তার মুখের বসন্তের কালো কালো দাগ আর ছাগ্‌লে দাড়ি কয়গাছা জয়গুনের কাছে বিশ্রী ঠেকে। বয়স পঁচিশের ওপরে হবে, জয়গুন অনুমান করে। মেয়েকে নদীতেই ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তা ছাড়া আর কি!

দুলা এবং আর যে দু'এক জনের পায়ে জুতো আছে, তারা উঠে গিয়ে বিছানায় বসে। বাকী সবাই এক এক করে জলচৌকির ওপর বসে পা ধোয়। তারপর বিছানার পাশে আর একজনকে খড়ম ছেড়ে দিয়ে মজলিশে এসে বসে।

সকলের শেষে জুতো পায়ে থপ্ থপ্ শব্দ করতে করতে আসে গদু প্রধান। বেঢপ চটি জোড়া বিছানার পাশে রাখতে ভরসা হয় না তার। শফীকে কাছে পেয়ে জিজ্ঞেস করে—এই হানে রাখলে থাকবো ত? না চুরি যাইব?

মজলিশের মাঝ থেকে একজন বলে—গেলই বা চুরি। পুরান গেলে নতুন আন্‌বেন।

—তোমরা এহনও নাবালক। জানো, পুরান জোতা আর পুরান চাদরের মর্ম? পুরান জোতা আর পুরান চাদরের সম্মান বেশী।

জুতো জোড়া হাতে করে যেতে যেতে আবার বলে—নতুন জোতা পায়ে দিয়ে মজলিশে গেলে মাইনষে কি মনে করে, জানো? মনে করে, নতুন হিখ্‌ছে জোতা পায় দিতে।

মৃদু হাসির গুঞ্জন শোনা যায়।

গদু প্রধান মসজিদের মৌলবী সাহেবের পাশে জায়গা বেছে নেয়। বসবার আগে জুতো জোড়া পেছনে হোগলার নিচে রেখে দেয়।

গদু প্রধান এসে জুতো চুরির যে প্রসঙ্গ তুলে দেয়, তা আর থামতে চায় না। কার বিয়েতে কার জুতো চুরি গিয়েছিল, কার চামড়ার জুতো কার রবারের জুতোর সঙ্গে বদল হয়েছিল—এসব গল্প।

সবাই যখন গল্পে মেতে আছে, তখন হাসু এক ফাঁকে লোক গুণে যায়। জয়গুনকে গিয়ে বলে বেবাকে তেইশ জন, মা।

জয়গুন মাথায় হাত দেয়। সব শুদ্ধ পনেরো জনের আয়োজন করা হয়েছে। এখন কি উপায় করা যায় সে ভেবে উঠতে পারে না।

শফীর মা-কে ডেকে বলে—তুমি সামলাও। আমি আর পারি না, বইন।

—কোন চিন্তা নাই। এক কাম কর। চাইর সের চাউলের ভাত চাপাইয়া দে। আমি ডাইলে দুই বদনা আর দুধে এক বদনা পানি মিশাইয়া দেই। যেমুন মাছ, তেমুন বড়ি না অইলে কি দুইন্যাই চলে? পালবরাদ্দে আইছে যেমুন, খাইব তেমুন ঝুড়া পানি।

জুতো চুরির গল্প ছেড়ে কার খেতে কি রকম ধান হবে, কোন্ বিলের ধানে পোকা ধরেছে, কার বছরের খোরাকি হবে, কার হবে না—এ সব আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে।

একজন বলে—পরধানের চিন্তা নাই। কম কইর্যাও পাঁচ-ছয় হাজার ট্যাকার ধান বেচ্‌তে পারব।

গদু প্রধান চুপ করে থাকে। মজলিশের মধ্যে তার টাকার তারিফ করলে সে খুশীই হয়।

এবার দুলার বাপ সোলেমান খাঁ অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে পড়ে। সে বলে, স্বাদীন যে অইল হের কোন নমুনাই যে পাইলাম না আইজও। দিন দিন যে

খারাপের দিগেই চল্‌ল। মওসুমের সময়ই চাউলের দর এত, শেষে না জানি কি অয়!

শেষে যদি কিছু হয়, তবে গদু প্রধানের পোয়াবারো। চালের দর চড়ুক—মনে মনে সে তাই কামনা করে।

একজন বলে - দ্যাখছ, কাপড় পাওয়া যায় না বাজারে। খালি জোলইর‍্যা কাপড়। তাও কুড়ি-বাইশ ট্যাকা জোড়া। একি কিন্‌তে পারে?

গদু প্রধান বলে - আব কিছু দিন পর এও পাইবা না। বউ-ঝিরা ঘরের বাইর অইতে পারব না।

জুলার চাচা লোকমান বলে—কত আশা-ভর্‌সা আছিল। স্বাদীন অইলে ভাত কাপড় সাইয্য অইব। খাজনা মকুব অইব। কিন্তু কই? বেবাক ফাঁট্‌কি, বেবাক ফাঁট্‌কি। আবার লেল গাড়ীর ভাড়াও বাইড়্যা গেল।

—আরো কত দ্যাখ্‌বা মিঞা, মাত্র বিছমিল্লা।—মৌলবী সাহেব বলেন। তারপর গদু প্রধানের কানে কানে কি বলেন।

গদু প্রধান বলে—দশটার মইদ্যে বিয়া পড়াইতে অইব। কই সোলেমান? শোন এদিগ।

সোলেমান খাঁ এলে আস্তে আস্তে গদু প্রধান বলে—তোমার বেয়ানের আগে তোবা করাইতে অইব।

—ক্যাঁ?

—ক্যাঁ আবার! হায়ানের মত যেইখানে হেইখানে ঘুইর‍্যা বেড়ায়, দ্যাখ্‌তে পাও না? ভালা মাইন্‌ষের মাইয়া। বিয়াও অইছিল ভালা ঘরে। ভালা জাতের মাইয়া এই রকম বেজাত বেপর্দা অইলে আমাগই বদনাম। তোবা করাইয়া দিতে অইব। পরচাতে আর যেন বাড়ীর বাইর না অয়।

—হেইডা ত ভালা কথাই।

—তুমি কথাডা মজলিশে উডাও। জোরে কইও যেন ঘরের তন তোমার বেয়ান হোন্‌তে পায়। আমি আছি তোমার পিছে।

—না, আপনেই উডান। আমার শরম করে।

গদু প্রধান বলে বেশ জোরের সাথেই—বিয়ার আগে বৌর মা'রে তোবা করাইতে অইব। পর্দার বরখেলাপ করে বুইল্যা এহনি তারে তোবা করাইতে অইব। তোবা না করাইলে মৌলবী সাব কলমা পড়াইব না। আর হে ছাড়া কে কলমা পড়ায় আমি দেইক্যা লইমু।

মৌলভী সাহেবের মুখের ওপর মজলিশের সমস্ত চোখ একযোগে এসে পড়ে। মৌলভী সাহেব এবার একজন বেপর্দা স্ত্রীলোক ও তার স্বামীর কেচ্ছা শুরু করেন।

জয়গুন মায়মুনের চুলের জট্ ছাড়াতে শুরু করেছিল। গদু প্রধানের কথা

তার কানে আসতেই সে লাফ দিয়ে ওঠে। শফীর মা-র কাছে গিয়ে বলে—হোনলা নি শফীর মা ?

—হ, হোনলাম। তার কি করতে চাও ?

—কি করতে চাই ? তোবা আমি করতাম না। আমি কোন গোনা করি নাই। মৌলভী সা'ব বিয়া না পড়াইলে না পড়াউক। আমার মায়মুনের বিয়া দিমু না।

এইডা কি কথার মতোন কতা। ট্যাকা দিছে তারা।

—ট্যাকা দিছে. পেড ভইর‍্যা খাইয়া ট্যাকা ওসুল কইর‍্যা যাউক। আমি ত আর ট্যাকা সিন্দুকে ভইর‍্যা থুই নাই।

—না, না। ওই হগল কথা রাখ। এমুন ঘর আর পাবি না। আর আইজ এই রহম কইর‍্যা ফিরাইয়া দিলে বদনামী অইব কত! তোর বাড়ীতে আর কেও থুক্ ফেলতেও আইব না। আবার গদু পরধান আছে এর পিছে। ওকি যেমুন তেমুন গোঁয়ার! ও যদি মনে করে, উর মাড়ি চুর করে।

জয়গুন চিন্তিত হয়। তার মুখে কালো ছায়া। সে ভাবে—তওবা করলে ঘরে বন্ধ হয়ে থাকতে হবে। ঘরে বন্ধ হয়ে থাকার অর্থ—না খেয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে মরা। জয়গুনের চোখ ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়। সে তীব্র কণ্ঠে বলে—না, আমি তো'বা করতাম না।

মজলিশে মৌলবী সাহেবের গলা শোনা যায়। তিনি গল্প বলছেন—ঐ লোকটা তার বেপর্দা স্ত্রীকে কিছুতেই তালাক দিল না। তখন একজনের ওপর হুকুম অইল—ওরে কতল কর। লোকটাকে কাইট্যা ফেলা অইল। আর তার লহু থেইকা পয়দা অইল কি ? না, একটা হারাম জানোয়ার—খিঞ্জির—শুয়োর। এইবার আপনারা ছাখেন, পর্দা কি চীজ। পর্দা না মান্‌লে চল্লিশ বছরের এবাদতও কবুল হয় না খোদার দরগায়। সব বরবাদ অইয়া যায়। বেপর্দা স্ত্রীলোক আর রাস্তার কুত্তী সমান।

জয়গুন চম্‌কে ওঠে।

শফীর মা কেরামত ও জহিরুদ্দিন মোড়লকে ডেকে আনে।

জহিরুদ্দিন বলে—মৌলবী সা'ব ঠিক কথাই কইছে হাসুর মা। তো'বা কইর‍্যা ফ্যাল।

কেরামত সায় দিয়ে বলে—হ চাচি, তো'বা কর।

জয়গুন জ্বলে ওঠে—তো'বা কইর‍্যা ঘরে বইস্যা থাক্‌লে আমারে খাওয়াইতে পারবি ?

শান্ত হয়ে আবার বলে—তোমরা ইন্‌সাফ কইর‍্যা কও, তো'বা করলে কে আমারে ঘরে আইন্যা খাওয়াইব ? হাসু যা রোজগার করে ও দিয়া দুই পেট চলে না। মায়মুনেরে আইজ বিদায় দিলেও ওরে নাইয়র আনতে অইব।

ও অহনতরি শিশু। মাসের মইধ্যে দশদিন ও আমার বাড়ীতেই থাকব। এতগুলা পেট কেমুন কইর‍্যা চালাই, তোমরাই কও।

জহিরুদ্দিন বলে—খোদায় খাওয়াইব। মোখ দিছে যে, আহার দিব সে।

জয়গুন হাসে শ্লেষের হাসি।

কেরামত বলে—আইজকার দিনডার লেইগ্যা তো'বা কইর‍্যা নেও। তারপর—

—তো'বা তো'বা-ই। একবার করলে তা আর ভাঙতে পারতাম না।

বাইার গদু প্রধানের গলা শোনা যায়—অনেক রাইত অইল। কই কেরামত? চালাক কর।

—করছি মিঞা সাব।

কেরামত মজলিশে যায়। মৌলবী সাহেব দোর গোড়ায় এসে তাঁর মাথার লম্বা পাগড়ীটা খুলে তার এক প্রান্ত কেরামতের হাতে তুলে দিয়ে অন্য প্রান্ত নিজের কাছে রাখেন।

কেরামত ঘরের ভেতর গিয়ে বলে—ধইর‍্যা থাক, চাচি। হুজুর যা যা কইবেন, খেয়াল কইর‍্যা। দিলের মইধ্যে গাঁইথ্যা রাইখ্য সব।

দ্বিধার সাথে জয়গুন পাগড়ির মাথাটা দুই হাতে চেপে ধরে। তার মনের মধ্যে তখনও দ্বন্দ্ব চলছে।

মৌলবী সাহেব টানা সুরে থেমে থেমে কি বলে যান তার একটা কথাও তার কানে ঢোকে না। কেরামত যখন আবার তার হাত থেকে পাগড়ির প্রান্তটা নিতে আসে, তখন তার সম্বিত ফিরে আসে।

এবার খাওয়ার পালা।

জয়গুন তওবা করায় আজ মৌলবী সাহেবেরও খেতে আপত্তি নেই। একদিন তিনি জয়গুনের দেওয়া হাঁসের ডিম ফেরত দিয়েছিলেন। কিন্তু সেইদিনের সেই জয়গুন আর এখনকার জয়গুনে তফাত অনেক। একটু আগেও সে মৌলবী সাহেবের কাছে ছিল রাস্তার কুকুরের সামিল।

গদু প্রধান সামনের সারির একটা ছেলের দিকে তাকিয়ে বলে— কিরে আদেল, ভাত সামনে কইর‍্যা বইস্যা আছস ক্যান? খাইতে পারস না বুঝি?

—পারমু না ক্যাঁ? দুধ দিয়া মাইর‍্যা দিমু।

সাদত আলী বলে—আইজ কাইলকার ছেঁড়ারা পোয়া চাউলের ভাত খাইতে পারে না। এই বয়সে আমরা লোয়া খাইয়া লোয়া অজম করছি। খাইতে খাইতে মাজার কাপড় যে কয়বার ঢিলা করতে অইত তার শুমার নাই।

গদু প্রধান বলে—জোয়ান বয়সের কালে এক সের চাউলের ভাত অজম করছি আমি।

সাদত আলী বলে—পরধানের মনে আছে? হেই মধু আলইকরের

দোকানে তুমি আর আমি বাজী রাইখ্যা রসোগোল্লা খাইছিলাম। তুমি আমার তন ছয়খান বেশী খাইছিলা। আমি খাইছিলাম একচল্লিশটা, আর তুমি—

—আর আমি সাতচল্লিশটা। সাদত আলীর কথা শেষ না হতেই গতু প্রধান বলে।

লেতু পাশ থেকে বলে—রাইখ্যা দ্যাও ওই হগল কিচ্ছা। আইজ কাইলকার ছেঁড়ারা খাইতে পারে না? খাইতে পারে, মিয়াভাই কিন্তু খাওয়ায় কেডা? খাইতে না পারলে ভালই আছিল। খোদা খোরাক কমাইয়া দিলে ত খুশী অইতাম। শুকুর ভেজতাম খোদার দরবারে। মসজিদে শিন্নি দিতাম!

লেতুর মাথায় ছিট আছে। কিন্তু তার স্পষ্টবাদিতার জন্য অনেকে তাকে পছন্দ করে। গতু প্রধান কিছু বুঝতে না পেরে বলে - কি রহম?

—বোঝলা না, মিয়াভাই? তোমার গোলাভরা ধান আছে। এক সেরের বদলে দুই সের খাইলেও তোমার গোলা ঠিক থাক্‌ব। কিন্তু আমি সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলাইয়া রুজি করি পাঁচ সিকা। এই ট্যাকা পেডে দিমু, কাপোড় পিন্দুম, না এর তন রাজার খাজনা দিমু? ঘরে পরিবার আছে। তিনডা বাচ্চা আছে। আমার পেড যদি তোমার মতন এক সের খাইতে চায়, তয় উপায়খান অইব কি? সারাদিন খাইট্যা সোয়া সের চাউল গামছায় বাইন্দা ঘরে ফিরি। সাধে কি আর আইজ-কাইলকার ছেঁড়ারা খাইতে পারে না? খাইতে পারে না, না, খাইতে পায় না, কও। মাইনষের পেড ছোড অইয়া যাউক খোদার কাছে আরজ করি। বেবাকের পেডে মাজায় লাইগ্যা এক অউক। এক ছডাকের বেশী যেন খাইতে না অয়। এইডা অইলে আর আকাল অইব না দ্যাশে।

অনেকক্ষণ ধরে থাকা গ্রাসটা এবার মুখে দেয় লেতু।

তার কথা সবারই ভালো লাগে। শুধু গতু প্রধানের কাছে ভালো লাগে না। সে এবার হাঁক দেয়—আরে, এই খানে ভাতের গামলা লও। ডাইল লও। কেমুন খাদেম, অ্যা! খানেওয়ালা চিন না?

থালার ওপর ঝুঁকে পড়া নুব্জদেহ বৃদ্ধ নাজিমুদ্দিন মাথা উঠিয়ে বলে—লেতুরে আমরা পাগল কই আর ছাগল কই, ওর কথা কাঁডায় কাঁডায় সত্য। মাইন্‌ষের পেডটা না থাকলে আমি খুশী অইতাম। পেডের জ্বালাই বড় জ্বালা মাইন্‌ষের।

নানা জনের নানা কথার মধ্য দিয়ে খাওয়া শেষ হয়।

সোলেমান খাঁ মজলিশের মধ্যে একটা জায়গায় নিজের কাঁধের গামছাটা বিছিয়ে দেয়। তার চারপাশে কন্যা পক্ষের কেরামত ও জহিরুদ্দিন এবং বরপক্ষের প্রায় সমস্ত লোক কাঁধে কাঁধে মেশামেশি হয়ে বসে। প্রথম সারির পেছনে অল্প বয়সী ছেলেরা হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে তাকায় উৎসুক হয়ে।

সোলেমান খাঁ একটা টিনের পুরাতন স্যুটকেস খুলে গয়নাগুলি গামছার ওপর আলাদা করে জোড়ায় জোড়ায় সাজিয়ে রাখে। গয়নার মধ্যে বয়লা, গোল-খাড়ু, নাকফুল, নোলক। এগুলো হাত দিয়ে নেড়ে প্রথমেই আপত্তি করে কেরামত—আপনেরা গয়নার জোখা নেন নাই ? এত বড় গয়না কে পরব ?

—বড় অওয়ন ভালা। বউ আমাগ অহন ডেগা অইলে কি অইব ? এক বছর পর যহন সিয়ানা অইব তহন ঠিক কাপাকাপা অইব। ভাঙা-গড়া করলে রূপা আর রূপা থাকে না। ফুক্কা আইয়া যায়।

আসলে গয়নাগুলো ছিল ওসমানের প্রথমা স্ত্রীর। সে মারা যাওয়ার পর চোখা রূপার এই গয়নাগুলোকে মেজে ধুয়ে নিয়ে আসা হয়েছে।

জহিরুদ্দিন গয়না হাতে নিয়ে ভালো করে পরখ করে। নাকের নোলক ও নাকফুল ছাড়া আর কোনটাই তার কাছে রূপার বলে মনে হয় না। সে কেমিকেলের কানফুল জোড়া এক দিকে সরিয়ে হাত দিয়ে আর গুলো চোখের কাছে নিয়ে দেখে। কিন্তু বরপক্ষের এত লোকের সামনে কথা বলতে তার সাহস হয় না। সত্যিই যদি রূপার জিনিস হয়ে থাকে তবে মজলিশের এত লোকের সামনে লজ্জায় কান কাটা যাবে। কেউ হয়ত বলেও বসতে পারে—বাপের বয়সে রূপা ছাহ নাই কোন দিন ?

ওসমানের প্রথমা স্ত্রীর পাটের শাড়ী, একখানা লাল পেড়ে শাড়ী ও গয়নাগুলো ঘরে নিয়ে যায় কেরামত। হাতের বয়লা ও পায়ের গোল-খাড়ু স্থতো দিয়ে বেঁধে পরিয়ে দেওয়া হয় মায়মুনকে। পাটের দশ হাত শাড়ীটা এমন প্যাঁচিয়ে সামলানো হয় যে, দূর থেকে মায়মুনকে দেখে বোঝা যায় না। মনে হয় একটা কাপড়ের পুঁটলি।

মায়মুন আবদারের সাথে তার মা-কে বলে—মা, তুমি যাইবা না আমার লগে ?

—আমি যাইমু কি করতে মা ?

—আমি তোমারে ছাইড়্যা কেমনে থাকতাম ?

—ক্যাঁ ? হাসু যাইব, শফী যাইব।

মায়মুন নিশ্চিন্ত হয়।

জয়গুন আবার বলে—তোর চিন্তা নাই। দুই দিনের বেশী রাখতাম না তোরে পরের বাড়ী। পরশু লইয়া আইমু আবার। এই বার আঁইট্যা যা দেহি দুয়ার তক, দেহি কেমুন ছাহা যায়।

মায়মুন উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু এত বড় শাড়ীটা সামলানো তার পক্ষে কষ্টকর। শাড়ীটা বারবার পায়ের নিচে পড়ে তার হাঁটায় বাধার সৃষ্টি করে।

মায়মুনকে দেখে জয়গুনের চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। এ চোখের পানি সুখের না দুঃখের বলা শক্ত।

সাক্ষী ও উকিল যখন ঘরে আসে, তখন মায়মুন বসে বসে ঝিমুচ্ছে।

জয়গুন মাথার কাপড়টা একটু টেনে মায়মুনকে হাত দিয়ে আকর্ষণ করে—একি মায়মুন! ওঠ্, ছাখ্, কারা আইছে!

উকিল তখন বলতে শুরু করে—তোমারে সোলেমানের ব্যাটা ওসমানের লগে পঞ্চাশ ট্যাকা দেন্ মোহরে নিকাহ দিলাম। তুমি রাজী আছ?

জয়গুন মায়মুনকে বুকে চেপে ধরে। বলে—কও মায়মুন, হ রাজী আছি।

একথা বোঝার বা বলার মধ্যে কোন নতুনত্ব নেই মায়মুনের কাছে। কথা কয়টা তার অনুভূতিকে একটুও নাড়া দেয় না। তোতা পাখীকে শিখিয়ে দিলে সে যেমন বলে, মায়মুনও তেমনি মা-র কথা অনুসরণ করে।

—রাজী আছি।

সাক্ষী ও উকিল পরস্পরের দিকে একবার তাকিয়ে মুচ্‌কি হাসে। জয়গুন এক গ্লাস শরবত মায়মুনের হাতে দিয়ে বলে—নে লক্ষ্মী, এক চুমুক খাইয়া গেলাসটা দিয়া দে।

উকিল সরবতের গ্লাস নিয়ে সাক্ষীর সাথে বিয়ের মজলিশে চলে যায়।

এক সঙ্গে অনেকগুলো বিয়ে হচ্ছে বলে একটা ডুলিও পাওয়া যায়নি। বিয়ের পর তাই সোলেমান খাঁ তার ছেলে-বৌকে কোলে তুলে নিয়ে সকলের সাথে বাড়ীর দিকে পথ নেয়। মায়মুনের ছোট ও পাতলা শরীরের ওজনে সোলেমান খাঁ বিস্মিত হয়। একটা তুলো ভরা বালিশের মত মনে হচ্ছে তার কাছে। সে মনে মনে চিন্তিত হয়। জোয়ানমর্দ ছেলের জন্যে এতটুকু মেয়ে নেওয়া ঠিক হলো না বুঝি। আরো তিন তিনটি বছর পুষতে হবে ভাত-কাপড় দিয়ে, তবে ছেলের উপযুক্ত হবে বউ। কিন্তু এ তিন বছর—

সোলেমান খাঁ জোর করে চিন্তাটাকে সরিয়ে দেয়। ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে সে আজকের বিয়ের আনন্দটা মাটি করে দিতে চায় না।

ভোর রাতের দিকে বেশ শীত পড়ে। জয়গুন বাইরে চুলোর পাশে গিয়ে বসে। চুলোর মধ্যে বিয়ের রান্নার আগুন তখনও নিবে যায়নি। জয়গুন ঠাণ্ডা হাত দুটো চুলোর ওপর মেলে ধরে। মাথাটাও ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে। তার চোখ-ঝরা পানি চুলোর আগুনে পড়ে অস্পষ্ট ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ শব্দ করে আর সাথে সাথে বাষ্প হয়ে মিশে যায় বাতাসে।

পনেরো

আজকাল করিম বকৃশ কাসুকে কড়া নজরে পাহারা দেয়। যত দিন মাঠ ভরা পানি ছিল ততদিন কালাপানির বন্দীর মত ছিল কাসু। কিন্তু মাঠে

পথ পড়ার সাথে সাথে করিম বক্শ চিন্তিত হয়। তার মনে আশঙ্কা জাগে—কাসু হয়ত একদিন ফুড়ুত করে ওর মা-র কাছে চলে যাবে। সেদিন আর একটু আগে দুধ বেচতে বেরিয়ে গেলে সর্বনাশ হয়েছিল আর কি !

করিম বক্শ আঞ্জুমনকে সতর্ক করে দেয়—কানা বুড়ী আমার বাড়ীতে পাও বাড়াইলে ঠ্যাঙ্গা মাইর্যা খোঁড়া কইর্যা দিবা। আমার তিরিসীমানায় ছাখতে পাইলে, ওর আর এট্টা চউখ কানা কইর্যা ছাইড়্যা দিমু। আমার তুমড়ীবাজি অহনও ছাহে নাই বুড়ী !

আঞ্জুমন করিম বক্শের হৃদয় জয় করার মতলব নিয়ে বলে—বুড়ীরে ছাখলে ভালা মানুষ বুইল্যা মনে হয়। কতাও কয় যেন মিছরির শরবত। দিলের মধ্যে এত কালি কে জানে !

কানা বুড়ীর দোষ কীর্তন করায় আঞ্জুমনের ওপর করিম বক্শ মনে মনে খুশী হয়। কিন্তু সে তাকে বিশ্বাস করে না। সন্দেহ হয়—কাসুর মাথাটা হয়ত ইতিমধ্যেই আঞ্জুমন বিগড়ে দিয়েছে। ঘরে-বাইরে এ রকম ষড়যন্ত্র অসহ্য। কোন রকমে মনের গোসা মনে চাপা দিয়ে সে কাসুকে পাহারা দেয়। বাইরে গেলেও সে কাসুকে সাথে করে নিয়ে যায়। যেদিন সাথে নেওয়া সম্ভব হয় না, সেদিন গরুর দড়ি দিয়ে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখে কাসুকে।

কয়েকদিন ধরে ধান কাটার ধুম পড়েছে। করিম বক্শ তার নারকেলের হুঁকোটা কাসুর হাতে দেয়, আর আগুনের মালসাটা নিজের হাতের তালুতে বসিয়ে অপর হাতে দুটো কাস্তে নিয়ে মাঠে রওয়ানা হয়।

কাসুর হাতে একটা কাস্তে দিয়ে বলে—আমার লগে থাইক্যা ধান কাটতে হিগ্। বড় অইলে এই কইর্যা খাইতে অইব।

কাসু তার ডান হাতের ছোট্ট মুঠোর মধ্যে কাস্তের মোটা হাতল ভালো করে সামাল দিতে পারে না। কোন রকমে হাতলটা চেপে ধরে সে দু'একটা করে ধানের ছড়া কাটতে আরম্ভ করে।

মাঠে আরো অনেক জমিতে ধান কাটা শুরু হয়েছে। দূরের একটা জমি থেকে কৃষাণদের সমবেত গান ভেসে আসে—

কচ্-কচা-কচ কচ্-কচা-কচ
ধানরে কাটি,
মুঠা মুঠা ধান লইয়া বান্দি আঁটি-রে।
(ও ভাই) ঝিঙ্গাশাইলের হুড়ুম ভালা
বাঁশফুলেরই ভাত,
লাহি ধানের খইরে ভালা,
দইয়ে তেলেসমাত—রে।

কস্তুরগন্ধী চাউলরে আলা,
সেই চাউলেরি পিঠা ভালা,
সেই না পিঠায় সাজিয়ে থালা
দাও কুটুমের হাত—রে।

আল্লাদি বউ কোটে চিড়া
মাজায় রাইখ্যা হাত,
সেই না চিড়ায় কামড় দিয়া
বুইড়ার ভাঙে দাঁত—রে

মিয়া বাড়ী ঘটক আসে
কন্যা-বিয়ার কথার আশে,
বোরো ধানের ভাত খাওয়ানে
মিয়ার গেল জাত—রে।

পাশের একটা জমিতে আলোচনা হচ্ছে। একজন বলে—আমরা হেদিন বৈডকে ঠিক করলাম, সাতভাগা অইলে কেউ ধান কাটতাম না। কিন্তুক ছাখ্, ছমিরদ্দির দল সাতভাগায় গদু পরধানের ধান কাটতে শুরু করছে।

আর একজন বলে—আবার গানও লাগাইছে ফুর্তির ঠেলায়।

—হেইয়া করব না! বেয়াক্কেলরা এড়ুকও বোঝো না, এই বারের যেই ধান, তা সাত ভাগের এক ভাগ নিয়া কি ওগ বাপ-মা-র ফত্তা করব ?

—এই বচ্ছর যে ধানের আবস্থা, এই রহম অইব কে কইছিল? জুইতের ধান অইলে না অয় সাত ভাগায় কিছু অইত। কিন্তুক একটা ধানের ছড়ার মধ্যে চাইর আনাই মিছা।

বর্ষার সময় ধানগাছের রকম দেখে অনেকেই অনেক আশা করেছিল। কিন্তু সবুজ ধান যখন সোনালী রঙ ধরতে শুরু করে, তখন চাষীরা ধানের ছড়া দেখে মাথায় হাত দেয়। এক একটা ছড়ার মধ্যে চার আনা ধানই অপুষ্ট—চালশূন্য চিটে। এখানে সেখানে ধানগাছ মরে যাওয়ায় জমিগুলো টাক-পড়া মাথার মত হয়ে আছে।

করিম বক্শ কয়েক 'ঘোপ' কেটে আলের ওপর এসে পা ছড়িয়ে বসে। পাশের জমি থেকে ধানকাটা রেখে লেদু মিয়া আলের দিকে আসতে আসতে বলে—ভালা কইর‍্যা তামুক সাজ, চাচা। একটা দম দিয়া যাই।

করিম বক্শ বাঁশের ডিবা হতে তামাক নিয়ে সাজতে থাকে। অদূরে বসে কাসু ধানগাছের ডগা দিয়ে বাঁশী তৈরী করার চেষ্টা করছে। সূর্য-দীঘল

বাড়ীর তালগাছটা বেশী দূরে নয় এখান থেকে। গাছটা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে।

লেদু বলে—কাসুরে এই মাথা-ফাডা রউদের মইদ্দে লইয়া আইছ ক্যাঁ, চাচা? ওরে বাড়ীতে রাইখ্যা আইলেই পার।

—এহন এট্টু আধটু রউদ মাথায় না নিলে অইব ক্যাঁ? নোয়াব সাইজ্যা বইয়া থাকলে ত কাম অইত না। আর এই শীতের মিডাম রউদে তেজ নাই।

—তেজ নাই। তয় বড় হুকনা রউদ। ছাহ না, চউখ-মোখ টানতে শুরু করছে।

কাসুর হাত থেকে ধানগাছের নলটা নিয়ে লেদু বলে—দে, বানাইয়া দেই।

বাঁশী তৈরী করতে করতে লেদু বলে-মাইয়ার বিয়াতে গেলা না যে চাচা? তোমার পরাণ কি দিয়া বানাইছে খোদায়? পাথর না পোড়া মাডি দিয়া, কও দেহি? মায়া-দয়া কি এক্কেরেই নাই তোমার পরাণে? কাসুর মা—

করিম বক্‌শের ভ্রূকুটি ক্ষণেকের জন্য লেদুর মুখ বন্ধ করে রাখে। সে কাসুর দিকে বাঁশীটা ছুঁড়ে দিয়ে আবার শুরু করে—তুমি অমুন কর ক্যাঁ, চাচা? কাসু বড় অইয়্যা ওর মা-রে বিচ্‌রাইয়া—

করিম বক্‌শ সাজানো কল্কেটা হুঁকোর মাথায় না বসিয়ে ছুঁড়ে মারে লেদুর দিকে, চেঁচিয়ে ওঠে—চুপ কর শয়তানের বাচ্চা! মশ্‌কারির জা'গা পাস না? মানুষ চিনস না তুই?

লেদু ঘাড় নীচু করে আত্মরক্ষা করে। তার মাথার ওপর দিয়ে শোঁ করে কল্কেটা ধানগাছের ঝোপের মধ্যে গিয়ে পড়ে।

আশপাশের জমি থেকে কৃষাণরা ছুটে আসে—কি অইল? কি অইল?

লেদুই বলে—কিছুই না। যাও তোমরা।

লেদু কল্কেটা তুলে গামছা দিয়ে মুছতে মুছতে বলে—রাগ করলা নি, চাচা? আর কোনদিন কিছু কইমু না। এই কান ডলা খাইলাম দশবার।

করিম বক্‌শ তখনও রাগে গর গর করছে।

লেদু নিজেই এবার তামাক সেজে হুঁকোটা করিম বক্‌শের হাতে দেয়। তারপর বলে—তোমার জমিনে এইবার ধানে বরাদ্দ নাই। আমাগ লগে ধান কাটতে যাইবা? খুরশীদ মোল্লার বটতলার ক্ষেতে ধান মন্দ অয় নাই। দিবও ছয় ভাগা।

করিম বক্‌শের রাগ থামে। তার বদমেজাজের জন্য কেউ তাকে দলে নিতে চায় না। লেদুর এ প্রস্তাবে সে খুশী হয়। বলে—কবে যাইবা তোমরা?

—এই জমিনের ধান কাড়া অইলে। তুমিও তোমার জমিনের ধান কাইট্যা কাবার কর।

—কাবার আমার কাইল অইব। পাতলা পাতলা ধান কাটতে দেরী লাগে না। এইবার তিনডা মাসের খোরাকীও অইব না। গেল বছর ছয় মাসের ধান পাইছিলাম। এহন তোমরা যদি দলে নেও, তয়ই না বাঁচতে পারমু।

—তোমারে দলে নিতে ত আপত্তি নাই! আপত্তি কিয়ের লেইগ্যা জানো? তোমার মেজাজের লেইগ্যা দলের কেউ রাজী অয় না। যাউকগ্যা, আমি বেবাকেরে বুঝাইয়া ঠিক কইর‍্যা নিমু। তুমি তোমার মেজাজখান ঠাণ্ডা কর। আর একটু অইলে আইজ আমার মাথাডা ফাডাইয়া দিছিলা আর কি!

করিম বক্শের নিজের জমির ধান কাটা শেষ হয়েছে। খুরশীদ মোল্লার বটতলার খেতে ধান কাটতে যাবে সে। কিন্তু কাসুকে আর পেছনে টানতে ভালো লাগে না। বটতলার খেত অনেক দূর! রোদের মধ্যে এত দূরে নিয়ে ছেলেটাকে বসিয়ে কষ্ট দেওয়া তার ইচ্ছে নয়। এ কয় দিনে ছেলেটা শুকিয়ে গেছে। তার চোখ-মুখের দিকে তাকালে মায়া হয়। আর যে ভয়ে সে কাসুকে সাথে সাথে নিয়ে বেড়ায়, সে ভয় সব জায়গায়ই দেখা দিয়েছে। কাসুকে ওর ফুফুর বাড়ী থেকে নিয়ে আসার পর যতগুলো ঘটনা ঘটেছে তাতে কাসু হয়ত অনেক কিছুই বুঝতে পেরেছে। তবুও সে সাধ্যমত চেষ্টা করে। বাজার থেকে বিস্কুট, জিলিপি, কদমা এনে কাসুকে খেতে দেয়। নিত্য-নূতন খেলনা দিয়ে তাকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করে। কোন লোককে ওর কাছে ঘেঁষতে দেয় না, পাছে কেউ ওর মা-র কথা বলে দেয়।

কাল পান্তা ভাত খেয়েই করিম বক্শ ধান কাটতে যাবে। কিন্তু কাসুকে বাড়ীতে রেখে যেতে তার মন সরে না। আবার তাকে সাথে নিয়ে গিয়েও কোন লাভ নেই। সেখানে উস্কানি দেওয়ার লোক আছে যথেষ্ট। জয়গুনের বাড়ীর কাছের কেরামত আছে লেতুর দলে। কে কখন কোন তাল দিয়ে বসে বলা যায় না। সে ভাবে—তাল দিতে পারে সব্বাই, মিডাই দিতে পারে না কেউ।

মহাসমস্যা করিম বক্শের সামনে। চিন্তা করে সে কোন সমাধান খুঁজে পায় না। আঞ্জুমন তামাক দিয়ে যায়। তামাক টানতে টানতে সে চিন্তা করে। তার চিন্তা তামাকের ধোঁয়ার সাথে কুণ্ডলী পাকাতে আরম্ভ করে।

এক সময়ে হুঁকোয় টান দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় করিম বক্শ। তারপরই তার চোখে মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

হুঁকোটা বেড়ার সাথে ঠেকিয়ে রেখে সে এক লাফে বেরিয়ে পড়ে। পাশের বাড়ীর হারুনকে ডেকে চুপি চুপি যুক্তি করে দু'জনে।

হারুন বলে—সাদা চুল পাইমু কই ?

—আমি যোগাড় কইর‍্যা দিমু। তুই এট্টা সাদা কাপড় যোগাড় করিস। আর খবরদার, কেও যেন্ না জানে। তুই আর আমি, বুঝলি কথা ? তিন কান অইলেই সব্বনাশ।

একটু থেমে আবার বলে- আমার কাম যদি ফতে অয়, তয় তোরে এক-খান গামছা কিন্যা দিমু।

করিম বক্শ সন্ধ্যার সময় কাসুর কোমরের দড়ির বন্ধন খুলে দেয়। কড়া পাক দেওয়া গরুর দড়িটার দাগ বসে গেছে কোমরে। করিম বক্শ আদর করে ডাকে—কাসু অ-কাশেম! চল্ বা'জান, তোরে টিয়াপক্ষীর বাচ্চা ধইর‍্যা দিমু। ঐ তেঁতুল গাছে টিয়ার বাসা আছে।

কাসু উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

—চল্ আমার লগে।

করিম বক্শ কাসুর হাত ধরে তেঁতুল গাছের দিকে এগিয়ে যায়। পথে যেতে যেতে করিম বক্শ বলে—আমারে -- বা'জান কইয়া ডাক দে।

দীর্ঘ চার বছর কাসু ফুফুর বাড়ীতে কাটিয়েছে! কেও তাকে ঐ নামে ডাকতে শেখায়নি। অনভ্যস্ত বলে এখন বা'জান ডাকতে কাসুর লজ্জা হয়। বাপের কাছে এসে সে আদর স্নেহ যা পেয়েছে, তার চেয়ে মার-ধর খেয়েছে ঢের বেশী। করিম বক্শ ছেলের কাছে পিতার উপযোগী কোন ভক্তি-শ্রদ্ধাই অর্জন করতে পারেনি। সে যা অর্জন করেছে তা ভয়। কিছুটা ভয় আর বেশীর ভাগই লজ্জায় কাসু বা'জান বলে ডাকতে পারে না। এজন্য কত দিন মারও খেয়েছে। মার খেয়ে অনিচ্ছায় উচ্চারণ করেছে কয়েক বার। কিন্তু মুখ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে শব্দটি কোনদিন বের হয়নি।

করিম বক্শ আবার বলে···কিরে, ক। না কইলে টিয়াপক্ষীর বাচ্চা দিমু না।

এত লোভ দেখানো সত্ত্বেও কাসু মুখ বুজে থাকে। কোন কথাই বের হয় না মুখ দিয়ে। করিম বক্শ আর পীড়াপীড়ি করে না।

তেঁতুল গাছের কাছাকাছি যেতেই কি রকম এক গোঙানির শব্দ শুনে কাসু থমকে দাঁড়ায়।

করিম বক্শ বলে—কিরে, কি অইল ?

—অইডা কি ছ্যাহা যায় ? তেঁতুল গাছের টিকিতে বইয়া রইছে!

করিম বক্শ কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করে বলে—সত্যই ত! পাক্না চুল ছাইড়্যা বইয়্যা রইছে! আবার গোঙায়!

করিম বক্শ চোখ দুটো বড় করে বলে—খাড়া, দেইখ্যা লই।

কাসু এবার করিম বক্শের হাত ধরে তার গায়ের সাথে মিশে দাঁড়ায়। করিম বক্শ কাসুকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে।

—কাসু শিগগীর আমার কোলে ওঠ্। বাপ্রে বাপ্! এইডা ত আর কিচ্ছু না! এইডা গোঙাবুড়ি! গলা টিপ্যা ধরব! আল্লা। আল্লা, বাঁচাও! আল্লা, আল্লা! কাসু, আল্লার নাম কর। আল্লা, আল্লা।

কাসু করিম বক্শের বুকের মধ্যে মুখ লুকায়। ভয়ে চোখ বন্ধ করে। কাঁপে থরথর করে। করিম বক্শ কাসুকে কোলে নিয়ে দৌড় দেয়। বাড়ী এসেও কাসু চোখ খোলে না।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে করিম বক্শ বলে—কাসু, আমারে বা'জান কইয়া ডাক দে। বা'জান না ডাকলে গোঙাবুড়ী বোলাইমু।

অন্ধকারের মধ্যে শিউরে ওঠে কাসু। করিম বক্শকে জড়িয়ে ধরে দুই হাতে। তার চোখের সামনে তখনও যেন সে দেখছে গোঙাবুড়ীর বিকট মূর্তি।

করিম বক্শ কাসুকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার ভান করে বলে—সইর্যা যা আমার কাছতন। আমারে বা'জান না কইলে এহনি গোঙাবুড়ী ডাক দিমু।

কাসুর ভীত-কম্পিত কণ্ঠ অস্ফুট শব্দ করে—বা'জান।

করিম বক্শ সাড়া দেয়। তারপর বলে—কাসু, বাড়ীর বাইরে যাইস্ না কিন্তুক, খবরদার! ঐ গোঙাবুড়ী গলা টিপ্যা ধরব! তেতুল গাছে আরো একটা পিচাশ আছে! হেইডার নাম ছালাবুড়ী। ছালার মইধ্যে ভইর্যা তোর মতন ডেগা পোলা পাইলে লইয়া যায়। তারপর তেঁতুল গাছে বইস্যা রক্ত খায়।

কাসু করিম বক্শের বুকের মধ্যে শিউরে ওঠে। তার কাঁপুনি করিম বক্শও অনুভব করতে পারে।

সে আবার বলে—খবরদার! কানাবুড়ীর সুরত ধইর্যা ছালাবুড়ী ধইর্যা লইয়া যাইব।

করিম বক্শ তার অদ্ভুত ফন্দির সফলতায় মনে মনে খুশী হয়। কাসুকে বাড়ীতে রেখে এখন নিশ্চিন্তে কাজ করা যাবে। কাসু ভুলেও জয়গুনের বাড়ীর দিকে পা বাড়াবে না। কারণ পথের ওপরেই তেঁতুল গাছ। আবার ছালাবুড়ীর চেহারা নিয়ে কানাবুড়ীও এসে আর সুবিধে করতে পারবে না।

করিম বক্শের মতলব হাসিল হয়েছে। কাসু এখন আর বাড়ী থেকে বের হয় না। আগে বাড়ীর উত্তর পাশটায় গিয়ে দাঁড়াত সে। সূর্য-দীঘল বাড়ীর তালগাছটার দিকে চেয়ে চেয়ে সে অনেক সময় কাটিয়ে দিত। রোজ ঐ তালগাছটা দেখে দেখে সে তার মা-র চিন্তাটাকে তাজা করে নিত মনের

মধ্যে। মা-র অভাব তাতে অসহনীয় হয়ে উঠত। তেঁতুল গাছে গোঙাবুড়ী দেখার পর সে আর কোন দিকে পা বাড়ায় না।

সে কখনো ফুলির বিছানার পাশে, কখনো উঠানে, কখনো বা রান্নাঘরে তার সৎমার পাশে বসে কাটিয়ে দেয়। এমন কি গোয়াল ঘরের পাশে যেতেও এখন তার সাহস হয় না।

মা-র মধুর চিন্তা তার মনে বার বার যে ছাপ রেখে গেছে, তা কখনও মুছবার নয়। সে স্থায়ী ছাপকে এখন ভূতের বীভৎস মূর্তি যেন রাহুর মত গ্রাস করছে। গোঙাবুড়ীর গোঙানি, ছালাবুড়ীর ছালা, তাদের নখর ও দাঁতের এলোমেলো কল্পনা কাসুকে সব সময়ে সন্ত্রস্ত করে রাখে। কোন ঠুংঠাং শব্দ শুনলেই সে ভয়ে অস্থির হয়। রাত্রে ঘুমের ঘোরে সে চীৎকার করে ওঠে। করিম বক্‌শ সে চীৎকারে সজাগ পেয়ে কাসুকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করে—কিরে কাসু, অমুন করস্ ক্যান ?

কাসু কোন উত্তর দেয় না। করিম বক্‌শের বুকের মধ্যে গিয়েও সে কাঁপে থর থর করে।

হঠাৎ একদিন কাসুর জ্বর হয়। প্রথম দিন-দুই করিম বক্‌শ মোটেই গা করে না। তিন দিনের দিন বেশ তোড়জোড়ের সাথে জ্বর ওঠে। বিছানায় পড়ে পড়ে কাসু প্রলাপ বকে।

করিম বক্‌শ দাওয়ায় বসে মাটির ওপর আঁচড় কেটে বাকী খাজনার হিসেব করছিল। সে ঘরের মাঝে উঠে এসে বলে—কাসু, অ কাসু! কি অ্যাঃ ? অমুন করস্ ক্যাঁ ?

—ছালাবুড়ী আইল! উঃ—উঃ - উঃ! না—না, বা'জান কইতাম না।'

করিম বক্‌শ কাসুর মাথায় কপালে হাত দিয়ে দেখে। হাত রাখা যায় না। মনে হয়, পুড়ে যাবে হাত।

—মা, মা, মাগো মা।

করিম বক্‌শ বলে ম্যাঁও ম্যাঁও করস ক্যাঁ ? আল্লা আল্লা কর। আল্লায় রহম করব।

কাসুর হুঁশ নেই। সে কখনো বিড় বিড় করে, কখনো বা টানিয়ে টানিয়ে প্রলাপ বকতে থাকে।

করিম বক্‌শ আরো একদিন দেরী করে। কিন্তু কাসুর জ্বর বন্ধ হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা যায় না।

করিম বক্‌শ উদ্বিগ্ন হয়। সে তাড়াতাড়ি করে ফকির বাড়ী যায়। গ্রামের সেরা ফকির দিদার বক্‌শ এসে হাতের লাঠিটা বেড়ার সাথে ঠেকিয়ে রেখে কাসুর বিছানার পাশে বসে।

কাসু প্রলাপ বকছে—ওইডা কি ? তেঁতুল গাছ!

কিছুক্ষণ বসে থেকে দিদার বক্‌শ চোখ বুজে ওপরের দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটে চাপ দিয়ে বিজ্ঞের মত কয়েকবার মাথা নাড়ে। তারপর গাম্ভীর্যের সাথে বলে—আর ছাখ্‌তে অইব না। মোখ দেইখ্যা আগেই আমি বোঝতে পারছি।

করিম বক্‌শ উদ্বেগ ভরা কণ্ঠে বলে—কি, পাগল ভাই ?

দিদার বক্‌শকে সবাই পাগলা দিদার বলে।

সে বলে—আবার কি ! কথা হুইন্যাও মালুম করতে পার না ? ছাহ না কেমুন বিল্‌কি-ছিল্‌কি কয় ?

—আমিও আগেই মালুম করছি কিছুডা। সব সময় খালি কয় গোঙাবুড়ী আইল। গলা টিপ্পা ধরল। আল্লা খোদার নাম নাই মোখে। আর কেবল ম্যাঁও ম্যাঁও করে। আমার দাদার মোখে হুনছি, ভূতে পাওয়া মানু আল্লার নাম ভুইল্যা যায়। এহন কি করা যায়, পাগল ভাই ?

—কিছু চিন্তা নাই ! হোন, একখান ন্যাক্‌ড়া লইয়া আহ্‌। আর এক চামুচ কড়ুতেল।

ফকিরের নির্দেশ মত করিম বক্‌শ ন্যাক্‌ড়া ও সর্ষের তেল নিয়ে আসে। ন্যাকড়া দিয়ে দড়ি পাকিয়ে ফকির তার এক প্রান্ত ডুবিয়ে ধরে তেল-ভরা ঝিনুকের মধ্যে। তারপর বাতির শিখার ওপব দড়ির তেল-মাখানো মাথাটা পোড়া দেয়। দড়ির প্রান্ত থেকে যখন ধোঁয়া বেরুতে শুরু করে, তখন ফকির কুণ্ডলায়িত ধোঁয়াসহ গরম প্রান্তটা কাসুর নাকের মধ্যে বার বার প্রবেশ করিয়ে দেয়।

কাসু যন্ত্রণায় উঃ করে ওঠে প্রত্যেক বার। তার কোমরটা বিছানা ছেড়ে উঁচু হয়ে ওঠে। শক্তি নিঃশেষ করে হাঁচি দেয় কয়েক বার।

মুখে হাসি টেনে ফকির বলে—অ্যাঁচি দিছে, আর চিন্তা নাই। এই অ্যাঁচির ঠেলায় আলাই-বালাই পলাইব। যদি একেন্ত না-ই পলায়, তয় মগরিবের ওক্তে একবার খবর দিও। আইজ রাতেই বৈডক দিমু। হেইখানে বোলাইয়া ওর চৌদ্দ-গোষ্ঠির ছেরাদ্দ করমু। ভালয় ভালয় যদি না যায় তো ওস্তাদ শেখ ফরিদের নাম লইয়া এমুন মন্তর ঝাড়মু, যার তেজে সুড় সুড় কইর‍্যা আমার বোতলের মইদ্দে ঢুকব। আমি তহন চট্‌ কইর‍্যা বোতলের মোখ্‌ বন্ধ কইর‍্যা দিমু। তারপর আমার শিথানের নিচে মাডিতে গর্ত কইর‍্যা বোতলডা উপুড় কইর‍্যা বহাইয়া মাডি দিয়া ঢাইক্যা দিমু। আমার শিথানের নিচে কি একটা দুইডা ! এই রহম কত ভূত-পেত্নী, দানা-পিচাশ জিন-আতশ কবর দিয়া থুইছি, লেখা-জোখা নাই। কিন্তুক জাহিলগুলার মউয়ত নাই। রাইতে যহন বালিশে মাথা রাখি, তহন কত কান্দা-কাডি ! কয়—আর কোন দিন আদমজাতের ক্ষেতি করতাম না। একবার ছাইড়্যা ছাও।

তোমার গোলাম অইয়া থাকমু। তোমারে পাকিস্তান জয় কইর‍্যা দিমু, পাকিস্তানের রাজা বানাইমু। আমিও কই—আমি রাজা অইতে চাই না। তোরা রোজ কিয়ামত পর্যন্ত বোতলের মইদ্যে থাকৃবি। গোলমাল করলে উফায় নাই।

করিম বক্শ শোনে মনোযোগ দিয়ে। ফকিরের গল্প শুনে সে বিস্ময়ে হতবাক। একটা কুলোয় করে সে সোয়া সের চাল আর সোয়া পাঁচ আনা পয়সা এনে ফকিরের পায়ের কাছে রেখে দেয়।

রাত বারোটার পর বৈঠক। মোমবাতি-আগরবাতি জ্বালিয়ে লোকজন ও সাগরেদসহ দিদার বক্শ ফকির 'ভারানে' বসে।

আগেই সে জিজ্ঞেস করে—কার উপ্রে চালান দিমু, করিম বক্শ? তোমার উপ্রে?

—আমার উপরে! না—না—না খবরদার ভাই, খবরদার! আমার ডর করে।

—ডর করলে চলব ক্যাঁ? তোমার উপ্রে ত আর চিরজনম ভার অইয়া থাক্ব না। আমার কাম অইয়া গেলে আবার নামাইয়া দিমু।

—না। আর কেওরে কইয়া গ্যাহেন।

—কে আছে আর? রুস্তম, তুমি? সাদেক? হারুন? কিছু ডর নাই। এক্কেরে পান্তাভাত।

সবাই মাথা নেড়ে অস্বীকার করে। শেষে ফকির তার এক শাগরেদকে ঠিক করে। তার ওপরেই ভর করবে ভূত।

দিদার বক্শ মোমবাতি নিবিয়ে দিয়ে সবাইকে সাবধান করে দেয়—খবরদার, কেও চউখ উপর দিক কইর‍্য না! ভূতের চউখে চউখ পড়লে তোমাগ চউখ গইল্যা পানি অইয়া যাইব।

ফকির এবার বাবরি চুল নাচিয়ে গলার মধ্যে কেমন ফ্যাঁস-ফ্যাঁস করে 'জিকির' আরম্ভ করে।

এক সময়ে ঘরের চালার ওপর ঢিল পড়তে শুরু করে।

ফকির বলে—চাইঙ্গা মারস ক্যাঁ? পিড়পিড়াইয়া ঘরে আয়। ঘরে আইতে অইবই।

কিছুক্ষণ পরে ঘরের চালাটা কড়কড় করে ওঠে। সাথে সাথে ফকিরের চেলাটিও দুলতে আরম্ভ করে আর গলার ভেতর অদ্ভুত ফ্যাঁস-ফ্যাঁস শব্দ করে—হ্যাঁরে—হাঁই—হুম।

সবাই বুঝতে পারে, ওর ওপরে ভূত 'ভর' করেছে।

দিদার বক্শ এবার টানা সুরে বলতে আরম্ভ করে—

আমার নাম দিদার বক্‌শ শুইন্য মন দিয়া
আমার নামে ভূত-পেত্নী সবাইর কাঁপে হিয়া!
শেখ ফরিদের নাম লইয়া যদি মন্তর ঝাড়ি,
হাজার গণ্ডা ভূত-পেত্নী ভেন্টাইবার পারি।
হ্যাঁরে—হাঁই—হুম—হাঁই—হুম—হাঁই।
তোমার লেইগ্যা বইস্যা আছি, কও তোমার নাম।
কিবা জাত, কিবা গোত, কোন্ খানেতে ধাম?
হ্যাঁরে—হাঁই—হুম—হাঁই—হুম—হাঁই।

শাগরেদের ওপর চালান-দেওয়া ভূত বলে—

আমার নাম ল্যাজ ফট্‌কা থাকি ডালে ডালে,
কাচ্চা-বাচ্চা পাই যদি ভরি দুই গালে।
সিয়ানা অইলে তার কাঁন্ধে চইড়্যা বসি,
লহু-মাংস শুষে খাই সারা দেহ চষি।
হ্যাঁরে—হাঁই—হুম—হাঁই—হুম—হাঁই।

রুস্তম অন্ধকারের মধ্যে বাম হাত চালিয়ে পাশের সাদেকের পিঠে চাপ দেয়। উদ্দেশ্য, সাদেকের মনে এ ব্যাপারে আরো বেশী বিস্ময় জাগিয়ে তোলা। কিন্তু সাদেক কাঁপছে থর থর করে। তার রক্তও বুঝি হিম হয়ে যায়।

পাশের ঘরে কাসু থেকে থেকে প্রলাপ বকছে।

ফকির আবার বলে—

শোন্‌রে ভাই ল্যাজ ফট্‌কা, রাখ বাজে কথা,
বাঁচ্‌তে চাইলে উড়াল দে যথা ইচ্ছা তথা।
হ্যাঁরে—হাঁই—হুম—হাঁই—হুম—হাঁই।
এই বাড়ী ছাইড়্যা যদি না যাস্ চলে,
লোয়া পুইড়্যা লাল কইর‍্যা ছেঁকা দিমু গালে।
হ্যাঁরে—হাঁই—হুম—হাঁই—হুম—হাঁই।

ভূত বলে

তোর মতন ফকিরের রাখি কিরে ডর?
কত ফকির ভাইগ্যা গেল খাইয়া থাপ্পর।
হ্যাঁরে—হাঁই—হুম—হাঁই—হুম—হাঁই।

বিছানার ওপর দুই হাতের থাপ্পড় মেরে ফকির বিকট চীৎকার করে—

তয়রে হারামজাদা বইস্যা থাক সোজা,
পাগলা দিদার মন্তর ঝাড়ব বুঝবি এহন মজা।
কই গেলিরে ল্যাবা ভূত, কই গেলিরে ট্যাবা,
কই গেলি কাইল্যা ঠ্যাডা, কই গেলিরে খ্যাবা,

সমদ্দুরের ফেনা আইন্যা·

ভূত এবার ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। দুই হাতে ফকিরের পা জড়িয়ে ধরে বলে— না, না, না। আমি এহনি চইল্যা যাই। সব্বনাশ কইর‍্য না আমার। বাপ্পুস রে!

—হ, অহনি চইল্যা যা। দেরেং করলে বোতলের মইদ্যে আটকাইয়া ফালাইমু, কইয়া দিলাম হেই কতা।

—তুমি আমার মনিব। আমি তোমার নফর। যাওনের আগে একটা ভোগ দ্যাও।

—কিয়ের ভোগ?

—আড়াই গণ্ডা শবরীকেলা, মিহিন চাউলের ভাত
সেরেক পাঁচেক মাইপ্যা দিও কাইট্যা কেলার পাত।
ঝাল ছাড়া নুন ছাড়া পোড়া গজার মাছ,
রাইখ্যা দিও এইগুলা যেথায় তেঁতুল গাছ।

ফকির বলে—আইচ্ছা, আইচ্ছা, দিমু। তুই অহন পলা।

অন্ধকারের মধ্যে ঘরের চালাটা আবার কড়কড় করে ওঠে।

বাতি জ্বালাতেই দেখা যায়, ফকিরের শাগরেদ বিছানার ওপর বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। ফকির ও তার অন্যান্য শাগরেদ ছাড়া আর সবার মুখ ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে।

ফকির এবার পানিতে হাত ভিজিয়ে শাগরেদের গায়ের ওপর ছিটিয়ে দেয়। শাগরেদ লাফ দিয়ে ওঠে।

ফকির আড়ামোড়া ভেঙে শাগরেদকে জিজ্ঞেস করে—কিরে, কই আছিলি এতক্ষণ?

– ঘুমাইয়া পড়ছিলাম।

ফকির মাথা নাড়ে আর গোঁফের তলা দিয়ে হাসে।

করিম বক্শ বলে— ঘুমাইছিলা! আর তোমার উপ্‌রে এত তফরখানা গেল!

ফকির অভিভাবকের মত বলে—থাউক, থাউক, ওয়া নিয়া আর মাথা ঘামাইয়া কাম নাই। হোন করিম বক্শ, কামডা খুব সহজে অইয়া গেল। ওরে ওই হগল খাইতে দিলেই ও চইল্যা যাইব। কাইলই বাজার তন গজার মাছ, কেলা আর চিনিগুড়া চাউল আইন্যা আমার কাছে দিও। তেঁতুল গাছের গোড়ায় আমিই রাইখ্যা আসমু ঠিক রাইত দুপুরের সুময়। তোমাগ যেই ডর! তোমার উপরে এই কাম ছাইড়্যা দিতে ভরসা পাই না।

একটু থেমে আবার সে বলে—ভূত ছাইড়্যা গেলে কাসুরে গোসল করাইয়া পাক-সাফ করতে অইব।

—গোসল! এই জ্বরের মইদ্যে?

—হ, হ। অরকুথায় ছাখছ তুমি ? এইডাও জান না, ওরা আগুনের তৈয়ারী ? আমাগ মতন মাডির তৈয়ারী না। ঘেডির উপরে চাইপ্যা থাকলে শরীল গরম না অইয়া যায় ? পরশু বিহানে মোরগের বাকের আগে কাসুরে রাস্তার তে-মাথায় নিয়া গোসল করাইতে অইব। তুমি সাত পুকুরের পানির যোগাড় রাইখ্য। সাত ঘাডের না কিন্তুক। এক পুকুরেরও সাতখান ঘাড থাক্‌তে পারে। সাত পুকুরের পানি অওয়ন চাই।

ষোলো

মায়মুন শ্বশুর বাড়ী থেকে চলে এসেছে। জয়গুন রাগে ফেটে পড়ে। কঠিন স্বরে জেরা করতে আরম্ভ করে—না কইয়া পলাইয়া আ'লি ক্যা ? এহন মাইন্‌ষে হুনলে ঝাঁটা মারব মোখে।

—পলাইয়া আহি নাই মা। খেদাইয়া দিছে।

—খেদাইয়া দিছে!

—হ, ছাহ না আমার নাক-কান খালি। গয়নাগুলা খুইল্যা নিছে। পিন্দনের কাপড়ডা রাইখ্যা এই ছিঁড়া কাপড়ডা দিছে।

কৈফিয়তে জয়গুনের রাগ নামে। ব্যাপারটার কিছু কিছু সে হাসুর কাছে শুনেছিল সেদিন। কিন্তু তার শাশুড়ীর এরূপ আচরণের কোন কারণ হাসু বলতে পারেনি। সেও ভেবে পায় না। জয়গুন আবার জেরা করে—কি দোষ করছিলি ? ক' শিগ্‌গীর।

—কিচ্ছু দোষ করি নাই, মা।

মায়মুনকে শ্বশুর বাড়ীর কেউ পছন্দ করেনি। সোলেমান খাঁও না। কিন্তু অপছন্দের কথা সে কখনো মুখ ফুটে বলতে পারেনি। কারণ সে নিজেই দেখে শুনে ছেলের জন্যে বউ পছন্দ করেছিল।

মায়মুন যেদিন প্রথম শ্বশুর বাড়ী আসে, সেদিনই তার শ্বশুর-শাশুড়ীর মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়।

শাশুড়ী বলে—তুমি কি চউখের মাথা খাইয়া বউ দেখছিলা ? এই রহম জালি বউ দেইখ্যা হুইন্যা আনে কেও ? এহন ভাত কাপড় দিয়া পাল্‌তে অইব।

—জালি কোহানে ছাখছ তুমি ? এক্কেরে ঝুনা নাইকল।

—হ, ঝুনা না আরো কিছু। ও না পারব ওসমানের ঘর করতে, না পারব এক কলসী পানি আন্‌তে। দুই ঠ্যাং লইয়া ঢেঁকির উপ্‌রে ওঠলেও কথা হোন্‌ব না ঢেঁকি! দুই সের চাউলের ভাতের আঁড়ি উডাইতে গেলে ফেলাইয়া দিব। তহন ভাতও যাইব, আঁড়িও যাইব।

সোলেমান খাঁ কথাগুলোর গুরুত্ব বুঝতে পারে। কিন্তু নিজের কৃতকর্মের জন্যে স্ত্রীর কাছে সে হার মানতে রাজী নয়। সে স্ত্রীকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে বলে—তুমি কিচ্ছু চিন্তা কইর্যা না। হবায় বিয়ার পানি পাইছে। দুই মাসের মইদ্যেই ভাখবা বউ আমাগ লায়েক অইছে।

কিন্তু দিন পেরিয়ে যাচ্ছে। মায়মুন তার শ্বশুর-শাশুড়ীর চোখের সামনে তাদের ইচ্ছে মত বড় সড় হয়ে উঠল না। যেমন ছিল, তেমনটি রয়ে গেল। শাশুড়ীর রাগ ধরে—কেন সে ভোমরায় আল্ দেওয়া কদুর মত ঝিম ধরে থাকল, কেন হাতে-পায়ে বড় হয়ে উঠল না।

সোলেমান খাঁর এজলাসে প্রায়ই এ ব্যাপারে শুনানি হতে থাকে। একদিন সোলেমান খাঁর স্ত্রী বলে—ভাত খাইতে ত কম খায় না। আমাগ দুনা ভাত খায়। যদি জিগাই আর ভাত নিবি বউ? তয় কোন দিন 'না' করব না। আঁসের মতন গলা সমান খাইয়া টাব্‌বুস অইয়া তারপর উঠ্‌ব। এত খাওয়া ত' বড় অওয়নের নাম নাই। আর অইবই বা কেমনে? স্যূর্-দীগল বাড়ীর মাইয়া। পরাণ লইয়া বাঁইচ্যা আছে, এই কফালের ভাইগ্য। তোমারে হেইস্থম কত কইর্যা যে কইলাম, স্যূর্-দীগল বাড়ীর মাইয়া আননের কাম নাই। হেইয়া হোন্‌লা না। মাইয়ার উপরে পেত্নীর দিষ্টি না আছে ত কি কইলাম।

সোলেমান খাঁ মনোযোগ দিয়ে শোনে। তারপর বলে—মানুষ ত তিন আঙ্গুল। এত ভাত কই রাখে?

কে জানে কই রাখে। আমার মনে অয় গলার তন পাও পর্যন্ত বেবাকখানি ওর প্যাট। এমুন হাবাইত্যা ঘরের মাইয়া বেশী দিন ভাত কাপোড় দিয়া রাখলে তোমারে আর বিচরাইয়া পাওয়া যাইব না—তাল্লুক মুল্লুক বেচতে অইব।

সোলেমান খাঁ নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে। গালে হাত দিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে—আমার মনে লয়, তোমার কথাই খাড়ি। পেত্নীর দিষ্টি আছে। পেত্নী ওর লগে খায় বুইল্যাই না এত ভাত লাগে।

সোলেমান খাঁর স্ত্রী আবার বলে—হোন কই, এই রাক্‌কস রাহনের কাম নাই। হেদিন ওসমানের ঘরে দিছিলাম। শরমেরও কতা। রাইতে হেই কি চিক্কইর। আর এট্টু অইলে চৌদ্দ বাড়ীর মানু একখানে কইর্যা লইত? ছিঃ, ছিঃ! অ-ঘিন অ-ঘিন। বোঝলাম, এইডা জুয়ান অইতে অইতে আমার ওসমান ঠুণ্ডা অইয়া যাইব। আর এদ্দিন তক্কে বহাইয়া খাওয়াইলে ফউত অইয়া যাইবা, কইয়া রাখলাম। কম-সে-কম তিনখান বচ্ছর ত লাগব লায়েক অইতে।

—কি করতে চাও তয় ?

—আমি কই, ওরে ওর মা-র কাছে পাডাইয়া ছাও। মা-রডা খাইয়া বড় অউক। জেরে ছাহা যাইব।

সোলেমান খাঁ সব শুনে এবার রায় দেয়—ওরে ওর মা-র কাছেই পাডাইয়া ছাও। আমি আবার ওসমানের শাদী দিমু।

—গয়নাগুলা ?

—খুইল্যা রাখবা। ওসমানের বিয়া দিতে লাগব তো। আবার জোড়ায় জোড়ায় গয়না বানাইমু, ট্যাকা কই ? ট্যাকা কি গাছের গোডা যে, ঝুল দিলেই পড়ে ? খালি গয়না ক্যাঁ, কাপোড় হুইডাও রাইখ্যা দিবা। কয়মাস আগে কিনছি। অহনও তুই ধোপ পড়ে নাই। এই কাপোড় আর গয়না দিয়া হাজাইয়া নতুন বউ ঘরে আনমু।

তারপর একদিন হাসু ও শফী আসে মায়মুনকে দেখতে। মায়মুনের শাশুড়ী, ছুটি ননদ ও ছোট্ট একটি দেবর একটা চাঙারির চারপাশে চক্রাকারে বসে কাঁচা মটর-শুঁটি ছাড়াচ্ছিল। মানুষ আসার শব্দ পেয়ে মায়মুনের শাশুড়ী একবার তাকায়। তারপর মাথায় আঁচল টেনে আবার মটরের দানা বাছতে শুরু করে।

হাসু ও শফী পরস্পর মুখের দিকে তাকায়। এ রকম অবজ্ঞা ও অবহেলার কি কারণ থাকতে পারে, তারা ভেবে পায় না। হাসু জিজ্ঞেস করে—কেমুন আছেন মাঐ সা'ব ? মায়মুন কই ?

উত্তর দেয় মায়মুনের ছোট ননদ, গাঙ্গের ঘাডে পানি আনতে গেছে। তার মুখের কথা শেষ না হতেই মায়মুন আসে। কাঁখের কলসীটা ছোট। তবুও তার ভারে মায়মুন সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না। কোমর বেঁকিয়ে খোঁড়ার মত পা ফেলতে ফেলতে সে আসে। হাসু ও শফীকে দেখতে পেয়ে খুশীতে ভরে ওঠে। সে পানির কলসীটা রান্না ঘরে রেখে ছুটে আসে। হাসুর একটা হাত ধরে বলে—মিয়া ভাই গো, কোনসুম আইলা ?

—এইত আইলাম।

—আমি যাইতাম তোমার লগে।

জরিনা বিবি অর্থাৎ মায়মুনের শাশুড়ী এবার ফোঁস করে ওঠে—হ, যাও। ভাইর লগে অহনই চইল্যা যাও। হ হাশেম মিয়া, তোমাগ আল্লাদি বইন্‌গারে আইজই লইয়া যাও। আমরা আর রাখতে চাই না।

—কি অইছে মাঐ ? কোন দোষ করছে মায়মুন ?

—না বাপু, অমুন ঝিরকুইট্যা বউ দিয়া আমাগ চলব না। কই গেলি ওসমান ? কি কইছিলাম ?

জরিনা বিবি ঘরে যায় ওসমানের কাছে। আস্তে আস্তে বলে—গয়নাগুলা

খুইল্যা রাখ। পিন্দনের কাপোড়ডা রাইখ্যা এট্টা ছিঁড়া কাপোড় দিয়া দে! ওডা পিন্দা কোন রহমে শরম বাঁচাইয়া আতেপায়ে যাউক্‌গা ভাইর লগে।

ওসমানের চোখে-মুখে অক্ষমতা ফুটে ওঠে। হাসু ও শফীর উপস্থিতিতে এ কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে বলে—তুমি ছাও গিয়া। আমার শরম করে।

—আহা, আমার নতুন বউ রে! অত যদি শরম, তয় ঘোম্‌ডা দিয়া ঘরে বইয়া থাক। তোরা মরদ অইছিলি কোন্ দুক্‌খে? আমি মাইয়া মানুষ। পারি কি না-পারি ছাখ চউখ মেইল্যা!

জরিনা বিবি দুই গোত্তা দিয়ে দু'পা এগুতেই ওসমান বাধা দেয়—মা মা, হোন। ওরা আইজ যাউকগা। পরশু তরশু আইয়া যেন লইয়া যায়।

জরিনা বিবি দরজার ওপর দাঁড়িয়ে যায়। ওসমানের দিকে ফিরে বলে—আইচ্ছা, কইয়া দেই।

তারপর ঘর থেকে নিচে নেমে হাসু ও শফীর দিকে চেয়ে বলে—হোন বাপু। কাইল পরশু আইয়া তোমাগ বইনেরে লইয়া যাইও।

হাসু বলে—বিষয় কি? কি অইছে মাঐ

—কিচ্ছুই অয় নাই মিয়া। যা কই মনে থাকে যেন।

শফী হাসুর দিকে চেয়ে বলে—আইজই মায়মুনেরে লইয়া যাই।

না, আইজ থাউক। মা-র কাছে জিগাইয়া দেহি, যদি নিতে কয়, তয় লইয়া যাইমু।

হাসুর কথা শুনতে পেয়ে জরিনা বিবি বলে—মা-র কাছে আর হোন্‌তে অইব না বাপু। তোমার মা মানা করত না। কাইল আইয়া লইয়া যাইও।

—আইচ্ছা।

এই 'আইচ্ছা' বলে যে হাসু চলে গেল আর হাসুর দেখা নেই। জরিনা বিবি নিজেই মায়মুনের গয়না খুলে একটা ছেঁড়া কাপড় পরিয়ে তাকে তৈরী করে রেখেছে। তিন দিনের দিনও যখন কেউ এসে নিয়ে গেল না, তখন তার পরের দিন ভোর বেলা জরিনা বিবি নিজেই মায়মুনের হাত ধরে বাড়ীর নিচের মটর খেতের পাশে এনে ছেড়ে দেয়। তাদের পেছনে মায়মুনের দুটি ননদও এসে দাঁড়ায়।

দূরে সূর্য-দীঘল বাড়ীর তালগাছটা দেখিয়ে জরিনা বিবি বলে—ঐ তালগাছটা বরাবর চইল্যা যাও। খোদায় যদি তোমার কপালে এই বাড়ীর ভাত লেইখ্যা থাকে তো আবার আইও, অহন মা-র বুকের দুধ খাইয়া মোটা তাজা অও গিয়া।

—আমি একলা যাইমু? মায়মুন জরিনা বিবির মুখের দিকে তাকায়।

—একলা যাইবা না তো দোকলা পাইবা কই ? যাও। তোমার রূপ বাইয়া বাইয়া পড়ে না সোনা। পথের মাইন্ষে ধইর্যা লইয়া যাইব না।

মায়মুন যেন কারাগার থেকে খালাস পেয়ে এল। তার আনন্দই হয়। আর সে আনন্দ বেড়ে যায় প্রত্যেক পদক্ষেপে। পেছনে তাকাতেও তার ভয় হয়।

কিন্তু বাড়ীতে পা দিয়ে মা-র কর্কশ জেরার মধ্যে পড়ে তার বুক দুরু দুরু করতে থাকে।

—জয়গুন আবার জিজ্ঞেস করে—কি দোষ করছিলি ?

—কিচ্ছু দোষ করি নাই মা।

—দোষ ঘাইট না করলে অম্বায়ই খেদাইয়া দিল ? হাসুকে দিয়া অহনই আবার পাডাইয়া দিমু।

শফীর মা আসে। কথার আগা-গোড়া না শুনেই শুরু করে—পুরুষের ঘরতন পলাইয়া আহে কেও ? পুরুষের ঘরই মাইয়ালোকের হাপন ঘর। হেইখানে জিন্দিগী কাডাইতে অইব। হউর-হাউরীব খেদমত করতে অইব। মরলেও হেই মাডি বুকের উপুর লইয়া থাকতে অইব। হেই মাডি ছাড়তে আছে ? হেই মাডি কামড় দিয়া পইড়্যা থাক্তে অয়।

মায়মুনের মুখের দিকে চেয়ে দেখে জয়গুন। অসহায় চোখ দুটো টল্‌টল্ করছে, করুণা ভিক্ষা করছে তার কাছে।

এবার মায়মুনের ওপরের সমস্ত রাগ জয়গুন শফীর মা-র ওপর ঢালে। সে বলে—থাউক, থাউক। আর বকর-বকর কইর্য না। তুমি বুড়া অইছ বাতাসে। তোমার কথায় মাডি খাইছি আমি। অমন বুইড়্যা জামাইর কাছে মাইয়া না দিয়া কুচি কুচি কইর্যা কাইট্যা গাঙ্গে ভাসাইয়া দেওয়ন ভালা আছিল। আমার বাড়ী থাকতে ও এমুন আছিল ? প্যাট ভইর্যা ভাত খাইতে না পারলেও, এই রকম হুকনা কাষ্ট আছিল না।

শফীর মা মায়মুনকে জিজ্ঞেস করে—তোর হাউরী প্যাট ভইর্যা তোরে খাইতে দেয় নাই, মায়মুন ?

—এই দুই মুঠ ভাত দিয়া কইত—নে, খাইয়া ওঠ বউ। দিনকাল ভালা না। প্যাট উনা থাকলে কোন ব্যারাম-আজার আইতে পারে না।

—অ্যাঁহ-হ্যাঁ-হ্যাঁ। কাসুর মা বাড়ীতে আছ ?

গলা খাঁকারি দিয়ে সাদেক মিয়া সকলের সামনে এসে দাঁড়ায়।

জয়গুন মাথায় কাপড়ের আঁচল টেনে দেয়। শফীর মা জিজ্ঞেস করে,—কি খবর সাদেক মিয়া ?

—খবর বেশী ভালা না। কাসুর খুব অসুখ। যহন-তহন অবস্থা।

জয়গুন চম্‌কে ওঠে। তার পায়ের নিচের মাটি সরে যাচ্ছে। দুনিয়াটা

অন্ধকার ঠেকছে চোখে। ঘোমটার নিচে অস্ফুট প্রতিধ্বনি হয়—কাসুর অসুখ। যহন-তহন অবস্থা!

—বে-হাল অবস্থা। করিম ভাই আমারে পাডাইয়া দিছে, তোমারে নিতে। দেরী অইলে—

সাদেক মিয়ার মুখ দিয়ে কথার শেষটা বের হয় না।

কাসুর শয্যা-পার্শ্বে দু'জন মৌলবী অনর্গল দোয়া-কালাম পড়ে চলেছেন। মাঝে মাঝে করিম বক্‌শের কথার নিচে তাঁদের স্বর চাপা পড়ে যায়। তার আকুল আবেদন কান্নার মত বেরিয়ে আসে—আল্লা, তুমি আমার কাসুরে বাঁচাও। তুমি জান-মালের মালিক। ওর জানের বদলে দুইডা জান সদকা দিমু। তুমি ওরে বাঁচাও। ওর জানের বদলে দুইডা খাসি সদকা দিমু। আল্লা, আল্লা, তুমি রহমান, তুমি রহিম। তুমিই বাঁচানে-ওলা। তুমি—

লম্বা ঘোমটা টেনে জয়গুন দরজার পাশে এসে দাঁড়ায়। তার পিছনে হাসু ও শফীর মা-কে দেখে করিম বক্‌শ বুঝতে পারে, জয়গুন এসেছে। করিম বক্‌শ মৌলবী দু'জনকে ইশারায় সরে যেতে বলে নিজেও বেরিয়ে যায়।

জয়গুন কাসুর বিছানার পাশে বসে ডাকে—কাসু, কাসু আমার সোনামণি।

শফীর মা, শফী, হাসু ও মায়মুন বিছানার দুই পাশে বসে। আঞ্জুমনও আসে। তাদের সকলের মাথা ঝুঁকে থাকে কাসুর মুখের ওপর।

শফীর মা বলে—চাইয়া ছাখ কাসু। তোর মা আইছে।

কাসু কোন সাড়া দেয় না। চোখ দুটো আধ-বোজা। মাথাটা কখনো সোজা হয়, কখনো এ-পাশে ও-পাশে হেলে পড়ে। তার নিশ্চল হাত পা ছড়িয়ে আছে লম্বা হয়ে। অনিয়মিত নিশ্বাস-প্রশ্বাসে বুকের ওপরের কাঁথাটা দুলে ওঠে। বুকের ওপর কান পেতে কফের ঘ্যাড় ঘ্যাড় শব্দ শোনা যায়।

জয়গুন আবার ডাকে—কাসু, বা'জান একবার চউখ মেইল্যা ছাখ।

করিম বক্‌শ ডেকে বলে—কাসু, চাইয়া ছাখ তোর মা আইছে।

কাসুর মাথাটা বাম কাত থেকে ডান কাত হয় শুধু। কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

আঞ্জুমন বলে—দুই দিন আগেও টাস্‌টাস্ কতা কইছে। দুই দিন ধইর‍্যা জ'ব বন্ধ। কত ফকির-কবিরাজ, কত কত পানি-পড়া, তাবিজ-তুমার। কিছুতেই কিছু অইল না। যে যা কইছে কোন তিরুডি অয় নাই। অহন আল্লার আতে সপর্দ। অউয়ত-মউয়ত আল্লার আত। আল্লায় যদি মোখের দিকে চায়।

করিম বক্‌শ দোর গোড়া থেকে বলে—আল্লা যদি কাসুরে দুইন্যায় রাইখ্যা যায়, তয় আমি জমিনের উপরে খাড়াইয়া মানৃতি করলাম, কাসুর

একটা জানের বদলে দুইডা খাসি জবাই কইর‍্যা তার গোশ্‌ত গরীব মিস্‌কিনরে বিলাইয়া দিমু। কাসুরে আজমীর শরীফ খাজা বাবার দরগায় লইয়া যাইমু।

জয়গুনের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে অবিরল ধারায়। হৃদয়ভেদী কান্নার বেগ চেপে রাখতে গিয়ে তার স্বর ভেঙে যায়। ভাঙা গলায় সে আঞ্জুমনকে বলে—দুইডা দিন আগেও যদি আমারে খবর দিত। ওর মোখের কথা হুইন্যা মনেরে বুঝ্‌ দিতে পারতাম। ওর 'মা-মা' ডাক হুইন্যা পরাণ শীতল করতাম।

একটু থেমে আবার বলে—তোমরা ডাকৃতর দেহাইছিলা?

—ডাকৃতর কি করব? কত ফকির হট্ট খাইয়া গেল!

—ওহোঁ। তোমরা যাই কও, আমি ডাকৃতর দেহাইমু।

অন্ধকারের মধ্যে জয়গুন আলো খুঁজে বেড়ায়। নিরাশার মধ্যেও আশা চেপে ধরে বুকে। ঝড়-ঝঞ্ঝায় মধ্যেও সে হাল ছেড়ে দেয় না।

হাসুকে সে নির্দেশ দেয়—হাসু, যা। জগদীশ ডাকৃতর না অয় আর কোন ডাকৃতর জল্‌দি কইর‍্যা লইয়া আয়। পথে দেরী করিস না। বলেই সে মনে মনে চিন্তা করে, ডাক্তার এলে টাকা দিতে হবে। কিন্তু কোথায় টাকা?

জয়গুন এবার শফীকে বলে- তুই বাড়ীত যা। বড় আঁস দুইডা বাজারে লইয়া যা। বেইচ্যা ট্যাকা লইয়া চালাক কইরা আ'বি। কিন্তুক দুইডা আঁসে কত পাওয়া যাইব! বড় জোর দুই ট্যাকা।

মায়মুন বলে—আমার আঁস দুইডাও লইয়া যাইও, শফী ভাই। আমাগ কাসু বাঁচলে কত আঁস পাওয়া যাইব আবার।

জয়গুন বলে—হ, চাইড্যা আঁসই লইয়া যা।

শফীর মা শফীকে সাবধান করে দেয়—জলদি কইর‍্যা যা। তোর কিন্তুক আবার শামুকের চল্‌তি। দেরী করলে উফায় রাখতাম না।

নিয়মের দুনিয়ায় অনেক অনিয়ম আছে। 'যেমন কর্ম তেমন ফল' তাই সব সময়ে পাওয়া যায় না।

মাথার ঘাম পায়ে-ফেলা সারাদিনের কর্মফল বড় সামান্য। পরোপকার প্রায়ই বিফলে যায়। সে কর্মে যদিও ফল ফলে, তা তিতো, বিষাক্ত।

এটা অনিয়ম বৈকি।

গ্রামের বুড়ো ডাক্তার রমেশ চক্রবর্তীর বেলায়ও এ অনিয়মটা নিয়মিত-ভাবে বিদ্যমান। বিশ বছর রোগী দেখে, ওষুধ ঢেলে-গুলে তিনি হাত পাকিয়েছেন। কিন্তু এই পর্যন্তই। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেও অর্থ সঞ্চয় করেননি কিছুই। অসহায় রোগীর চিকিৎসার বোঝাই ঘাড়ে নিয়েছেন শুধু। টাকার সিন্দুক বোঝাই হল না কোনদিন।

সাধারণভাবে গ্রামের লোকের আস্থা নেই অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার ওপর। তাদের ধারণা—অ্যালোপ্যাথিকের তেজালো ওষুধ পেটে গেলে রোগী যা-ও দু'ঘণ্টা বাঁচত, তাও শেষ হয়ে যায় দু'ঘণ্টা আগেই। গ্রামে তাই ফকির-কবরেজদের পশার বেশী। ওষুধ মেশানো পানির চেয়ে বেশী কদর মন্ত্র-পূত পানির। সোয়া সের চাল আর সোয়া পাঁচ আনা পয়সা দিয়ে যেখানে ফকির বিদায় করা যায়, সেখানে টাকা খরচ করে ডাক্তার বড় কেউ ডাকে না।

ধরাবাঁধা কয়েক ঘর লোক আছে রমেশ ডাক্তারের। ঘুরে ফিরে তারাই আসে। দু'টাকা দেয়, মাসখানেক ধরে চিকিৎসা করিয়ে নেয়। ওষুধ খেয়ে খেয়ে টাকার দাম তোলে। চিকিৎসায় টাকা খরচ করবার মত বড়লোক যারা, তারা এখানে আসে না। তারা যায় বড় ডাক্তার জগদীশ বাবুর কাছে। দিন-মজুরের কাছ থেকে দিন-মজুরী নিয়ে রমেশ ডাক্তারের দিন চলে টেনেটুনে।

রমেশ ডাক্তারের বাইরের ঘরটা একাধারে ডাক্তারখানা ও বৈঠকখানা দুই-ই। ঘরের এক পাশে দুটো আলমারী। তার মধ্যে নানা আকারের শিশি-বোতল সাজানো। ওগুলোর অধিকাংশই খালি। সুদিনে যখন ওষুধ পাওয়া যেত অপর্যাপ্ত, তখনও ওগুলো পুরোপুরি ভরা ছিল না। আলমারীর একটা তাকে ভারী ভারী কয়েকখানা ডাক্তারী বই। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল। তার এক পাশে ডাক্তারের বসবার জন্যে একখানা কাঠের চেয়ার, অন্য তিন পাশে টিনের চেয়ার তিনখানা। এক পাশে একটা লম্বা টুল। দেয়ালে পিঠ ঠেস্ দিয়ে আরাম করে বসবার জন্যে টুলটাকে দেয়ালের কাছ ঘেঁষে রাখা হয়েছে। অপর পাশে দেয়ালের সাথে ঠেকানো একটা কাঠের চেয়ার। তার পেছনের একটা পায়া ভাঙা। আসন গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের হুঁশিয়ার করার জন্যে পায়া-ভাঙা চেয়ারটায় কে একজন একটা কাগজ এঁটে দিয়েছে। তাতে লেখা খোঁড়া। এত হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও নিরক্ষর গদু প্রধান একদিন চেয়ারটা নিয়ে পড়ে গিয়েছিল।

ডাক্তারের চোখের সামনে একটা দেয়াল ঘড়ি। বহু দিন ধরে খারাপ হয়ে পড়ে আছে। কোন রসিক লোক ডাক্তারের অনুপস্থিতিতে ঘড়িটার কাঁচের উপর একটা কাগজ এঁটে দিয়েছে। কাগজটিতে লেখা —'কলেরা রোগী।'

লেখাটা দেখে রমেশ ডাক্তার হেসে ফেলে বলেছিলেন—কলেরা নয়, কলেরা নয়। হৃদ-বন্ধ। কলেরা হলে এমন ওষুধ খাইয়ে দিতাম—

- কলেরার আবার চিকিৎসা আছে নি? ডাক্তারের কথা শেষ না হতেই জাফর মিয়া বলে।

—নেই কেন? নিশ্চয় আছে। জীবনে কত কলেরা রোগী ভালো করলাম এই হাতে।

—তয় হেইডা আসল কলেরা না। পেডের অসুখ। আসল কলেরা বসন্ত অইলে আবার মানুষ বাঁচে ?

বাঁচে না মানে ? একশোবার বাঁচে। এবারও কত রোগী বেঁচে গেল আমার হাতে।

নিত্যানন্দ বলে—তুমি আবার মানুষ বাঁচাতে পারো নাকি, ডাক্তার ?

—নিশ্চয়ই পারি।

ডাক্তারের কথায় সবাই হেসে ওঠে। অনেকে মনে করে—ডাক্তারের ক্ষ্যাপামিটা আজ আবার বেড়ে গেল।

—এ কি! তোরা হাসছিস ? মানুষ যদি বাঁচাতে না পারি, তবে তোরা আসিস কেন ? আমার ওষুধ খাস কেন ? ডাক্তার টেবিলের ওপর চাপড় মারেন।

কালিপদ বলে—তোমার কাছে আসি মনের শান্তির জন্যে, মনেরে বুঝ দিতে। তা ছাড়া কি! তুমি বাঁচাতেও পার না, মারতেও পার না। মরা-বাঁচা ঈশ্বরের হাত।

কালিপদ ওপর দিকে আঙুল দেখিয়ে ঈশ্বরের অবস্থান নির্দেশ করে।

মুখ বিকৃত করে রমেশ ডাক্তার বলেন—মরা-বাঁচা ঈশ্বরের হাত। তবে দেব এক ফোঁটা পটাশিয়াম সায়নাইড ? দেখি কে বাঁচায় ?

নিত্যানন্দ বলে—তোমার ঐ বাজে কথা রাখো, ডাক্তার। মাথাটা তোমার আজ আবার গরম হয়েছে, বুঝলাম। জগদীশ সেন এত বড ডাক্তার, সেও এত বড কথা বলতে সাহস করে না। ঈশ্বরের ওপর ভরসা করে সে। সেদিন অজিত চৌধুরীর ছেলে মারা গেল। জগদীশ ডাক্তার চৌধুরীকে বল্ল—আমরা ওষুধ দিতে পারি, জীবন তো আর দিতে পারি না।

—ও সব ফাঁকা কথা বুঝলে ? অজ্ঞতা ঢাকবার পথ ওটা। লোককে সান্ত্বনা দেওয়ার বুলি। আসলে ও কথার কোন অর্থ হয় না। এমন অনেক রোগী আছে, যার বাঁচবার ভরসা ছিল না, আমাদের ওষুধ খেয়ে সে হয়ত বেঁচে ওঠে। ঐ-টুকু ওষুধ না পেলে হয়ত আর বাঁচত না। আমাদের হাতে এ-রকম বহু লোক বেঁচে যায়। যখন বেঁচে ওঠে তখন নাম হয় ওপরওয়ালার! তাঁর গুণ-কীর্তন হয়। মসজিদে শিরনি দেওয়া হয়। হরিলুট দেওয়া হয় মন্দিরে। আমাদের নামও নেয় না মুখে। জালাল শেখের টাইফয়েড হয়েছিল, জানো তোমরা। দুই মাইল পথ হেঁটে রোজ সকালে বিকালে হাজিরা দিয়েছি, ওষুধ দিয়েছি। আমার কাছে ক্লোরোমাইসিটিন ছিল না। জগদীশের কাছ থেকে নিজের টাকায় কিনে দিয়েছি। যখন বেঁচে গেল, তখন একদিন দেখাও করলে না এসে। আমাকে দিয়েছিল কত জানো ? তিন টাকা। শুনেছি, আজমীরের দরগায় জালাল পাঁচ টাকা মানত পাঠিয়েছে।

একটু দম নিয়ে আবার তিনি আরম্ভ করেন—আমাদের হাতে সব লোকই যে বাঁচবে তা তো বলছি না। এর কারণ অনেক। একটা কারণ হচ্ছে—চিকিৎসা বিজ্ঞানে আমাদের অজ্ঞতা। আমার হাতে যে রোগী মারা গেল, আর একজন ভালো ডাক্তারের কাছে সে হয়ত মরত না। তা ছাড়া রোগ নির্ণয়ে, ওষুধ-নির্বাচনে ভুল-ভ্রান্তি, ওষুধের অভাব, যন্ত্রপাতির অভাব—নানা কারণ আছে। এ ছাড়াও আছে রোগীর গাফিলতি। সময় থাকতে আসবে না। আসবে তখন যখন টলমল অবস্থা। ঐ অবস্থায় ডাক্তার ডেকে কোন কাজ হয় না। ডুবন্ত নৌকা উদ্ধার করা সোজা ব্যাপার নয়। কথায় বলে—মরণকালে লক্ষ্মীবিলাসের বড়ি কোন কাজ দেয় না। মানুষ মরবে, এত সত্য কথা। তবে অকাল-মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে তো। বাতির তেল ফুরালে তেল দিতে হবে। ঝড়ে নিবে না যায় তার জন্য ঢাকনা লাগাতে হবে। বাতিটা যে-দিন ফুটো ঝাঁজরা হয়ে ভেঙে যাবে, সে দিনের কথা আলাদা। অবশ্য সমস্ত লোককে অকাল-মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার মত চিকিৎসা এখনও আবিষ্কার হয়নি। তবে চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতি হচ্ছে দিন দিন।

সবাই বিরক্ত হয় ডাক্তারের ওপর। তারা মনে করে—আজ মাথাটা একটু বেশীই খারাপ হয়েছে ডাক্তারের।

কালীপদ বলে—রাখ তোমার বক্তিমা। এইবারে বিদায় কর।

ডাক্তার বলেন—একটু সবুর কর। ওদের আগে বিদায় করি। ওরা দূরের লোক। এসো দেখি দিল মহম্মদ। ক'দিন থেকে জ্বর?

—আইজ চাইর দিন।

ডাক্তার নাড়ী দেখেন। বুক পরীক্ষা করেন। তারপর বলেন—দেখি জিভ। হা করো, আ—এমন করে।

দিল মহম্মদ হা করে। তার নিশ্বাসের সাথে এক ঝলক দুর্গন্ধ এসে ধাক্কা মারে ডাক্তারের নাকে। তিনি মুখটা একপাশে সরিয়ে বলেন—কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়নি।

একটা কাগজে 'ব্যবস্থা' লিখে ডাক্তার বলেন—কোন ভয় নাই। এ কাগজটা কম্পাউণ্ডারকে দাও। দিনে তিনবার। ঠাণ্ডা লাগিও না। শিশি এনেছো?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা যাও। পরশু এসো আবার। আলাউদ্দিন, তুমি এসো। কি তোমার?

—প্যাটটা ফুইল্যা রইছে দুই দিন ধইর্যা। একবার খাইলে আর খাইতে ইচ্ছা করে না। ভাত দেখলে বমি আহে। খোয়াবে খাইলে হুনছি এই রকম অয়।

—অ্যাঁ, কি বল্লি ?

—মা কইছে, খোয়াবে যারা খায়, তাগ প্যাট ভার অইয়া থাকে এই রহম। অজম অয় না।

বুড়ো ন'কড়ি বলে—ডাক্তারের কাছে এ-গুলা কইস না। এই সব ভূতের ব্যামোর কিছু ডাক্তার বুঝবও না, বিশ্বাসও করব না। আমিও কত দিন স্বপ্নে খাইছি—রসগোল্লা, সন্দেশ, জিলাফি, কচরী, পানতুয়া—

ন'কড়ি মিষ্টির নামের শিকলি ছাড়তে শুরু করে।

মুচকি হেসে ডাক্তার বলে—খেতে কেমন লাগে ?

—কেমন লাগবে আবার! ভালা। ঠিক হালুইকরের মিষ্টির মতন। কিন্তুক অজম অইতে চায় না। অজম অইলে কি আর কথা আছিল ?

ডাক্তার রহস্য করে বলেন—সত্যি, হজম হলে আর কোন কথা ছিল না। বাজারে যখন রসগোল্লা সন্দেশ পাওয়া যায় না আজকাল, তখন স্বপ্নে বিনে পয়সায়—

—বেশ মজা কাইর‍্যা খাওয়ন যাইত। ডাক্তারের মুখের কথা লুফে নিয়ে ন'কড়ি বলে।

ডাক্তার এবার গর্জন করে ওঠেন—হুঁহ্, যত সব আহম্মক নিয়ে কারবার। যা এখান থেকে। স্বপ্নে রসগোল্লা খাগে। ওষুধ খেতে হবে না।

আলাউদ্দিন দাঁড়িয়ে থাকে। ডাক্তার হাত বাড়িয়ে তাকে একটু কাছে টেনে নেন। জামাটা তুলে রাগের সাথে জোরে জোরে তার পেট টিপতে শুরু করেন।

বাঁধা-ধরা একঘেয়ে জীবন ডাক্তারের এমনি করেই চলে। চলে ঘড়ির কাঁটার মত একই পথে। কিন্তু তাঁর কাছে বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে বলে মনে হয়নি কোনদিন। মূর্খ লোকের কার্য-কারণহীন, আজগুবি কথাবার্তা শুনে তিনি যত বিরক্ত হন, তাদের অজ্ঞতার জন্যে তার চেয়েও বেশী সহানুভূতি জাগে তাঁর মনে। এ সমস্ত লোকের নাড়ী দেখে দেখে তাদের ওপর কেমন একটা নাড়ীর টান জন্মে গেছে ডাক্তারের। ভোর বেলা এদের মুখ দেখলে তবেই তাঁর ভালো লাগে। তাজা হয়ে ওঠে দেহ-মন।

কিন্তু কিছুদিন ধরে ডাক্তারের দিনগুলো আর চলতে চায় না। যেন হুঁচোট খেয়ে চলছে দিনগুলো। স্বাধীনতা অর্জনের পরে বাস্তুত্যাগের হিড়িক পড়েছে দেশে। ভারত ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের চোখে লেগেছে আলোর ধাঁধা। ডাক্তারের স্ত্রীর চোখেও তাই লেগেছে। পাকিস্তান ছেড়ে যাওয়ার জন্যে তিনি অধীর হয়ে উঠেছেন। কিন্তু ডাক্তারের পাকা চোখে দূরের সে আলো নেশা জাগাতে পারে না। পারে না মায়ার সৃষ্টি করতে। স্বামী-স্ত্রীর এই বিরুদ্ধ মনোভাব সংসারের সমস্ত শান্তি নষ্ট করেছে। এই একই প্রসঙ্গ

নিয়ে কথার প্যাঁচাল শুরু হয় দু'জনের মধ্যে। সহজে তা থামতে চায় না। স্ত্রী নানারকম যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেন, বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে স্বামীকে প্ররোচিত করেন। কিন্তু আদম তার সঙ্কল্পে অটল। সে জানে, নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার অর্থ স্বর্গ-ভ্রষ্ট হওয়া। ঈভ তাই নিষিদ্ধ ফলের সাজি নিয়ে ব্যর্থ হয় বারবার।

আজও ডাক্তার রোগী দেখা শেষ করে সবে আঙিনায় উঠেছেন অমনি গিন্নী আরম্ভ করেন—ওগো শুনছো ? আর তোমাকে বলেই বা কি হবে ?

অন্যমনস্কভাবে ডাক্তার এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু গলা চড়িয়ে গিন্নি বলেন—জগদীশ ডাক্তার আজ যাচ্ছে, শুনেছো ?

—তাতে হয়েছে কি ?

—হবে আবার কি ? সবাই একে একে চলে যাচ্ছে। আর আমরা এখানে জপমালা নিয়ে বসে থাকি আর কি !

—হ্যাঁ, মালা জপতেই শুরু কর। তাই ভালো। দেখো ঈশ্বর যদি কিছু ব্যবস্থা করেন। চাও তো পুষ্পক রথও পাঠিয়ে দিতে পারেন তোমার জন্যে।

বিরক্তির মধ্যেও নিজের রসিকতায় হেসে ওঠেন ডাক্তার। তার হাসি গিন্নীর অন্তরে ঘা দেয়। তিনি বলেন—তা তুমি যেয়ো।

—আমি যাব ! উঁহু। এখান থেকে আমি একচুলও নড়ছিনে। এমন সাজানো বাগিচা ছেড়ে নরকে যেতে পারবো না।

কথায় সুবিধা করতে না পেরে গিন্নী বলেন—তা বেশ। এখানে থেকে মুসলমানের হাতে যদি কচু-কাটা না হও তো কি বল্লাম।

—ওসব বাজে কথা রাখো। এখানে কে তোমাকে মারছে শুনি ? কতগুলো পশুর প্ররোচনায় যা হয়েছিল, তা আর হবে না দেখে নিও। ভায়ের বুকে ছুরি বসিয়ে আনন্দ পাওয়া যায় না—সবাই বুঝতে পেরেছে। ভায়ের বুকের রক্তে যে করুণ অভিজ্ঞতা হল, হিন্দু মুসলমানের মন থেকে তা সহজে মুছে যাবে না। আর যদি একান্ত মুছেই যায়, তবে বুঝব তার পেছনে কাজ করেছে স্বার্থান্ধ হিংস্রতা। শুধু এখানেই নয়। সব জায়গায় এ হিংস্রতা দেখা দিতে পারে। যেমন আসামে 'বঙ্গাল খেদা' মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ধুতিবালাদের বিরুদ্ধে গুর্খারা কুকরি শান দিচ্ছে। বিহারে কোণঠাসা করে রাখা হচ্ছে বাঙালীকে। এখন এক গণ্ডগোলের ভয়ে পালিয়ে আর এক গণ্ডগোলের মুখে গিয়ে পড়তে হবে। এখানে আমাদের কিসের অভাব ? কোন্ দুঃখে যাব আমরা ঘর-বাড়ী ছেড়ে ? জানো না, এখানে আমরা মা-র কোলে আছি।

হাসু এসে ডাক্তারের উঠানে দাঁড়ায়।

ডাক্তারের খোঁজে সে এ-গাঁও ও-গাঁও ঘুরেছে। জগদীশ ডাক্তারকে পাওয়া

গেল না। তিনি পাততাড়ি গুটিয়েছেন। আজই চলে যাচ্ছেন দেশ ছেড়ে। হরেন ডাক্তারও নেই। তিনি অনেক দিন আগেই চলে গেছেন। তাঁর শূন্য ভিটা তচনচ হয়ে আছে ঘাস-লতা-পাতায়।

রমেশ ডাক্তার তখনও বকে চলেছেন—এখন হুজুগে মেতে অনেকেই বাড়ী-ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। যাদের টাকা নেই তারাও যাচ্ছে। অনেকে বাড়ী-ঘর বিক্রি করে যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারি না কিসের নেশায় যাচ্ছে এরা। কিন্তু দেখবে, আবার এরা ফিরে আসবে। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে ক্ষুধা ও রোগে আধ-মরা হয়ে আবার এরা ফিরবে। কিন্তু তখন আর মাথা গুঁজবার ঠাঁই মিলবে না। আমাদের পূর্ব-পুরুষ হিন্দু-মুসলমান আপনজনের মত কত যুগ ধরে কাটিয়েছে এ মাটিতে। একের ওপর নির্ভর করে বেঁচে উঠেছে আর একজন। একজন যুগিয়েছে ক্ষুধার অন্ন, আর একজন দেখিয়েছে আলো।

ডাক্তার পাশের দিকে দেখেন—গিন্নী নেই। কখন তিনি বেরিয়ে গেছেন। উঠানে হাসু দাঁড়িয়ে। দেখতে পেয়ে ডাক্তার বলেন—কিরে বাপু, কি চাই।

—আমার ভাইয়ের খুব অসুখ।

স্ত্রীর ওপর এতক্ষণ বক্তৃতা ঝেড়ে রমেশ ডাক্তারের মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে। তিনি বলেন—আমি যেতে পারব না।

কথাটা বলে তখনি ভাবেন—আর তো কেউ নেই। হরেন অনেক দিন আগেই চলে গেছে। জগদীশও আজ যাচ্ছে। এ তল্লাটে এ তিন জন ছাড়া আর কে আছে? ডাক্তার যাবার মনস্থ করেন। বাড়ীতে থাকলে আবার স্ত্রীর কথায় কান ঝালাপালা হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং রোগী দেখতে যাওয়া ভালো।

জামা গায়ে চড়িয়ে 'স্টেথস্কোপ' ও 'এমারজেন্সী ব্যাগ' নিয়ে ডাক্তার বের হন। পেছন থেকে স্ত্রী বাধা দেন—এই দুপুরে রোদ মাথায় করে কোথায় চল্লে আবার?

উত্তর না দিয়ে ডাক্তার এগিয়ে যান।

—চান করে খাও-দাও। বিকেলে যেও। স্ত্রী তাগাদা দেন।

স্ত্রীর কথাগুলোকে শ্লেষের আঘাত করে ডাক্তার বলেন—চান করব আবার খাব। এদিকে মানুষ মরে যাচ্ছে।

পেছন ফিরে ডাক্তার আবার বলেন—এখন দেখো, আমরা চলে গেলে এদের কি উপায় হবে। এতগুলো গ্রামের মধ্যে আমরা তিনটে ডাক্তার ছিলাম। দু'জনে তো চলেই গেল। আমিও যদি চলে যাই, তবে এরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

ডাক্তারের ব্যাগটা হাসু হাতে করে নেয়।

ডাক্তার রোগী দেখে চিন্তিত মুখে বলেন—ডবল নিমোনিয়া। এত দিন ছিলে কোথায়?

করিম বক্‌শ বলে—ফকির দেখছিল এতদিন।

—নাকের ওপর ঘা হয়েছে কেমন করে ?

—দড়ি পড়া দিছিল ফকির।

ডাক্তার দাঁতে দাঁত চেপে বলেন—ফকির! দড়ি পড়া! দেশের শাসন ক্ষমতা আমার হাতে থাকলে ব্যাটাদের ফক্করবাজি দেখিয়ে ছাড়তাম। ফাঁসি দিতাম ব্যাটাদের। এ নরহত্যা ছাড়া কিছু নয়।

ডাক্তার আসায় জয়গুন বড় করে মাথায় কাপড় টেনে পেছন ফিরে বসেছিল। তার বুকের ভিতর কে যেন হাতুড়ি পিটছে অবিশ্রান্ত। সে এবার ঘুরে ডাক্তারের পা ধরে করুণ মিনতি জানায়—ডাক্তার বাবু আমার কাসুকে বাঁচাইয়া ছ্যান্। আপ্‌নে আমার ধর্মের বাপ।

সতেরো

জয়গুন আহার-নিদ্রা ভুলে দিনের পর দিন ছেলের শয্যা-পার্শ্বে কাটিয়ে দেয়। মারমুনও থাকে মা-র কাছে। প্রত্যেক দিন খাবার সময়ে করিম বকৃশের ইঙ্গিতে আঞ্জুমন জয়গুনের হাত ধরে টানাটানি করে খাওয়ার জন্যে। বলে—ওই রহম পেটে পাথর বাইন্দা থাইক্য না। দুইডা দানাপানি মোখে ছ্যাও বুজান, নালে শরীল তোমার ভাইঙ্গা যাইব।

জয়গুন খেতে যায় না। সে ভাবে, এ বাড়ীর ভাত তার কপাল থেকে অনেক আগেই উঠে গেছে।

হাসু রোজ খাবার নিয়ে আসে। রেখে যাওয়া সে খাবার সে মায়মুনকে দেয়। নিজেও খাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তার খাওয়া আসে না। দু'এক মুঠো জোর করে গিলে এক মগ পানি খেয়ে একদিন কাটিয়ে দেয়।

দিনের বেলা যেমন তেমন করে কেটে যায়। কিন্তু রাত্রি বেলা জয়গুনের আর দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সে রাত্রির জন্যে প্রস্তুত হয়। বাতির তেল না থাকলে মায়মুনকে পাঠিয়ে পাশের বাড়ী থেকে কুপি মেপে তেল ধার আনে। একটা মাল্‌সাতে তুষ সাজিয়ে আগুন দিয়ে রাখে।

রাত্রে জয়গুনের কাছে থাকবার জন্যে শফীর মা আসে। সে 'বুড়া মানু' তাই তার ঘুম কম। রাত্রের যে কোন সময়ে ডাক দিলে তার সাড়া পাওয়া যায়। সে কাছে থাকলে মনে বল পাওয়া যায়। হাসুও দুই রাত্রি ছিল। কিন্তু ও ছেলেমানুষ। সন্ধ্যার পরেই ঘুমিয়ে পড়ে। সারা রাত্রির জন্যে আর তাকে সজাগ পাওয়া যায় না। শফীর মা-র জন্যে জয়গুন সন্ধ্যার আগেই বেশী করে পান ছেঁচে রাখে, যাতে কাসুর কানের কাছে ঠনর ঠনর করতে না হয়।

শফীর মা অনেকক্ষণ বসে থাকে জয়গুনের পাশে। তারা মুখোমুখি বসে। আগুনের মাল্‌সার ওপর হাতগুলোকে গরম করে। মাঝে মাঝে কান মুখ ও অন্যান্য অঙ্গে গরম হাত বুলিয়ে শীত তাড়াবার চেষ্টা করে। শফীর মা কখনো পান চিবোতে চিবোতে পিচ ফেলে মালসার মধ্যে। তুষের আগুন থেকে ধোঁয়া বের হয়। নানা কথায় সে জয়গুনকে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করে। তার নিরাশ মনে আশা জাগিয়ে তোলে। থানার ঘণ্টা যখন জোড়ায় জোড়ায় বাজে, তখন সে গুণতে আরম্ভ করে সাথে সাথে। বলে—বারো খান বাজল। এইবার এট্টু কাইত অই। আত দিয়া ছাখ, কঁ্যাতাডা ভিজ্যা প্যাচপেইচ্যা অইয়া গেছে।

শফীর মা কাঁথা উঠিয়ে মায়মুনের পাশ দিয়ে শুয়ে পড়ে। তার শীতল শরীরের ছোঁয়া লেগে মায়মুন একবার নড়া-চড়া করে ওঠে। শফীর মা বলে—চুপ কইর‍্যা থাক বেডী, অহনি উম অইয়া যাইব।

শফীর মা গরম হাত দুটো মায়মুনের গায়ে বুলিয়ে এবার ক্ষতি পূরণের চেষ্টা করে। জয়গুনকে বলে—আমাগ রক্ত ঠাণ্ডা অইয়া গেছে। খাড়াকখাড়ি গরম অয় না। ওগ রক্ত গরম। আমার শফীরে বুকে লইয়া হুইলে মুহূর্তকের মইধ্যে উম অয়। তা না অইলে পৌষ মাইস্যা শীতে ঠক্‌ঠক্ করতে করতে জান কবচ অওনের জোগাড়। মাইনষে কইতেই কয়—

পৌষের হিমে ভীম দমন,
মাঘের শীতে বাঘের মরণ।

শফীর মা শুয়ে শুয়ে গল্প আরম্ভ করে—ভীম একদিন তার মা-রে জিগায়—'মা, আমার তন বড় জোয়ান কে? তার মা কয়— আছে একজন। গাঙ্গের পার দিয়া আঁটলেই তার ছ্যাহা পাইবা। তহন পৌষ-মাইস্যা রাইত। ভীম কতক্ষুণ পর শীতে ঠক্‌ঠক্ করতে করতে বাড়ীতে আহে। মায় জিগায়—ছ্যাহা পালি বা'জান? ভীম কয়—'হ গো মা।'

জয়গুন কাঠি দিয়ে তুষের আগুন ঘেঁটে তাতিয়ে নেয়। আগুনে হাত-পাগুলোকে গরম করে।

ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে উত্তুরে হিম শীতল বাতাস ঢোকে। জয়গুনের শরীরের রক্ত জমে ওঠে যেন।

বাতাসে নিবু নিবু করে কুপিটা। জয়গুন উঠে সলতে উস্কিয়ে দেয়। এক প্রস্ত কাঁথা এনে আগুনে গরম করে গায়ের ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে কাঁথাগুলো পালটিয়ে দেয়।

করিম বক্‌শ এক সময়ে ডাকে—কাসু কি ঘুমাইছে?

বার দুই ডেকে করিম বক্‌শ ক্ষান্ত হয়। শফীর মা ঘুমিয়ে পড়েছে। জয়গুন ডান হাত বাড়িয়ে তাকে ধাক্কা দেয়। শফীর মা ধড়ফড় করে ওঠে। দীর্ঘ

একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলে—আল্লা-রছুল ! কি কাসুর মা ? সারাডা রাইত এম্বায় বইস্যা থাকবি ? তুই আয়, আমার বালিশে মাথা রাইখ্যা এট্টু ক্যাইত অইয়া থাক। ও এহন চুপ মাইর্যা আছে।

করিম বক্‌শ আবার ডাকে—ও কি ঘুমাইছে ?

—হ ভাই, এহন ঘুমেই আছে।

নিঝুম রাত। কোন দিকে সাড়া-শব্দ নেই। অনেকক্ষণ পরে পরে পাখীর কল্‌বল্‌ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। তারপর আবার নিস্তব্ধ। এমন নিস্তব্ধতার মধ্যে ঘরে শোয়া করিম বক্‌শের নিশ্বাস পতন পর্যন্ত গণনা করা যায়। কানের কাছে কাসুর বুকে কফের ঘ্যাড়-ঘ্যাড় শব্দ এবং তার অনিয়মিত হ্রস্ব দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাস জয়গুনের আশঙ্কাঘন মনে উদ্বেগ বাড়িয়ে দেয়। ঘন কালো অন্ধকার যেন চারদিক থেকে গিলে ধরবার জন্যে হা করে আছে।

শেষ রাতে ভয়ঙ্কর শীত নেমে আসে। জয়গুন আর একবার কাঁথা বালিশ গরম করে কাসুর বিছানা বদলে দেয়। নিজের হাত-পা শরীর তুষের আগুনের তাপে গরম করে। তারপর কাসুর কাঁথার নিচে শুয়ে তাকে নিজের বুকের তাপ দিয়ে গরম করবার চেষ্টা করে।

সপ্তাহ খানেক পরে একদিন ডাক্তার বলেন--আর চিন্তা করো না, মা। ভয় কেটে গেছে। তোমার ছেলে এবার ভালো হয়ে উঠবে !

জয়গুনের মুখের ওপর থেকে নৈরাশ্যের মেঘ কেটে যায়। আশার আলোয় মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার। ডাক্তারের ওপর কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে বুক। কিন্তু তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা তার জানা নেই। সে বলে—বাবা—তুমিই আমার কাসুরে বাঁচাইলা ! মরণঘর তন তুমিই ওরে ফিরাইয়া আনছ।

ডাক্তার আশ্চর্য হন। তাঁর সমস্ত জীবনে এমন সহজ সোজা কথা কোন নিরক্ষরের মুখে তিনি কখনও শোনেননি। ডাক্তার মানুষ বাঁচাতে পারে, এ-কথা বিশ্বাস করে না কেউ।

ডাক্তার বলেন—আমার চিকিৎসা ছাড়াও তোমার শুশ্রূষা অনেক সাহায্য করেছে। তুমি কাছে না থাকলে, সময় মত ওষুধ-পথ্য না দিলে এ রোগী বাঁচানো এত সহজ ছিল না।

কাসু ভালো হয়ে ওঠার সাথে সাথে জয়গুনের কর্তব্যও যেন ফুরিয়ে যায়। একদিন ভোর রাত্রে কাসুকে ঘুমে রেখে সে মায়মুনকে নিয়ে হাসুর সাথে বাড়ী চলে আসে।

জয়গুনের এমনি করে চলে আসার কারণও ঘটেছিল।

শফীর মা সেদিন আসেনি। জ্বর হয়েছিল তার। রাত্রে মা-র কাছে থাকবার জন্যে হাসু এসেছিল।

গভীর রাত্রি। হাসু ও মায়মুন ঘুমে অচেতন। কাসুও কতক্ষণ ছটফট

করে কিছু আগে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার শিয়রে আগুনের মালসার ওপর হাত রেখে জয়গুন ঝিমোচ্ছে।

করিম বক্‌শ অন্ধকারে বালিশ থেকে মাথা উঁচিয়ে ঘর ও বারান্দার মাঝের বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকায়। কয়েক দিন ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে তার কেমন নেশা ধরে গেছে। কুপির অস্পষ্ট আলোয় জয়গুনের মুখখানা বড়ই সুন্দর লাগে তার চোখে। চোখ দুটো ঘুমে ঢুলুঢুলু, কখনও বুজে আসে। সারা মুখে বেদনার ছাপ যেন সুন্দরতর করেছে তার মুখখানা।

করিম বক্‌শ আস্তে আস্তে বারান্দায় নেমে আসে। আওয়াজ পেয়ে জয়গুন গা ঝাড়া দিয়ে বসে। তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় লম্বা করে টেনে দেয়।

করিম বক্‌শ এসে কাসুর মাথায় হাত দিয়ে শরীরের তাপ দেখে। জয়গুন বুঝতে পারে, কথা বলার ভূমিকা ছাড়া এ আর কিছু নয়। সে একটু দূরে সরে বসে হাসু ও মায়মুন যেখানে শুয়ে আছে।

করিম বক্‌শ বলে—আমারে দেইখ্যা তুমি ঘুমডা দ্যাও ক্যা?

বার তিনেক হল এই একই অভিযোগ।

জয়গুন উত্তর দেয় না।

—আমারে আবার শরম কিয়ের? এত বচ্ছর আমার ঘর করলা, আর এহন আমারেই শরম! মাথার কাপড় উডাও, লক্ষ্মী। হোন আমার কথা।

জয়গুনের বুকের ভেতর ঢিপঢিপ করতে শুরু করে।

করিম বক্‌শ বলে—আমার কথা যদি রাখো, তয় একটা পরস্তাব করতে চাই।

জয়গুন নিরুত্তর।

—আইচ্ছা, আমি যদি আবার—

জয়গুন শক্ত একটা কিছু বলার জন্যে মনে মনে মুসাবিদা করে কিন্তু মুখ দিয়ে কিছু বের হয় না।

—তোমারে আবার ঘরে আনতে চাই।

কম্পিত কণ্ঠে জয়গুন বলে—না।

ক্যা? আমি শরা-শরিয়ত মতই করতাম।

শরিয়ত মত আগে একজনের লগে সাঙ্গা বইয়া হেইখান তন তালাক লইয়া তারপর? ওহোঁ।

—ওয়াতে দোষ কি? লক্ষ্মী, তুমি রাজী অও। তহন কি আম্মুকি করছি ঘরের লক্ষ্মী ছাইড়্যা দিয়া। শরিয়তে আইন আছে এই রহম নিকার।

শরিয়তে থাকলেও আমি পারতাম না।

—ক্যা? সতিনের ঘর বুইল্যা? যদি একবার মোখ ফুইট্যা কও

'সতীনের ঘর করতাম না' তয় ফুলির মা-রে রাইতপোয়াইলেই খেদাইয়া দিতে পারি। তুমি একবার এট্টু—

—ওহোঁ।

—ক্যাঁ? ঘরের লক্ষ্মী তুমি। করিম বকৃশ জয়গুনের একটা হাত ধরে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে। জয়গুন ঝাড়া দিয়ে সে হাত ছাড়িয়ে নেয়। পাশে হাসুকে হাত দিয়ে ধাক্কা দেয়—হাসু হাসু ওঠ।

করিম বকৃশ চোরের মতো সরে যায়।

বাকি রাতটা জয়গুন বসে কাটিয়ে দেয়। প্রথম মোরগের ডাকের সময় সে হাসু ও মায়মুনকে ডেকে তোলে। কাসু ঘুমিয়ে আছে। তার রোগ-শীর্ণ পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে জয়গুন চোখের পানি রাখতে পারে না। কাসুর গালে একটা চুমো দিয়ে তার গালের সাথে নিজের গাল ঠেকিয়ে রাখে কিছুক্ষণ।

সে আঞ্জুমনকে ডেকে কাসুর কাছে রেখে যায়। আঞ্জুমন কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞস করে—আইজ যাইবা ক্যাঁ?

—যাইমু না কি করমু আর? এহন ও ভালা অইয়া উডব। তুমি এট্টু নজর রাইখ্য বইন। তোমারও ত পোলা নাই। মনে কইর্য এইডা তোমার প্যাডের।

জয়গুন বাড়ী এসে প্রথমেই শফীর মা-র বিছানার পাশে গিয়ে বসে।

শফীর মা বলে—চইল্যা আলি ক্যাঁ? তোরে ছাখতে না পাইলে যদি ও চিল্লায়?

—চিল্লাইলে কি করতাম, বইন? যার পোলা হে-ই রাখব। আমার কি! সখেদে বলে জয়গুন।

—আমার ত মনে অয় না করিম বকৃশ ওরে রাখতে পারব। ঘুমের তন উইঠ্যাই যখন তোরে ছাখ্‌ব না, করিম বকৃশের দিল কইলজাডা খুইল্যা খাইয়া ফালাইব না!

—তার আমি কি করতাম। হেদিন কইছিলাম—ওরে আমার কাছে আইন্যা কিছুদিন রাহি। তারপর ভালা অইয়া গেলে যার পোলা হে-ই লইয়া যাইত। ব্যারাম তন ওঠলে এট্টু আবদার করব। হেইয়া সইজ্য অইলে তয় ত! কিন্তুক তুমি ত মত করলা না।

—কেমুন কইর্যা করি? আমাগ সূর্য-দীগল বাড়ী। এই বাড়ীতে মানুষ উজাইতে পারে না। আবার এক বচ্ছর ধইর্যা পাহারা নাই। এমন সোনার চান মানিক্‌রে এইখানে আন্‌লে যদি এট্টু উন্নিশ-বিস অয়, তয় বদনাম অইব তোর।

—ক্যাঁ। আমরা তো কতদিন ধইর্যা আছি। আমাগ কিঙঅইছে?

—আমাগ কতা আলেদা। আমাগ সইয়া আইছে। আর এতদিন বাড়ীর পাহারা আছিল। পাহারা যেই দিন তন নাই, হেই দিন তন আমার জ্বর যেন ঘন ঘন ওঠতে আছে! আবার মায়মুনেরও পরের বাড়ীর ভাত ওঠল। এইগুলো কি কম চোট্ ?

সূর্য-দীঘল বাড়ীর অমঙ্গল আশঙ্কা করে জয়গুন সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করে। তবুও তার মন মানে না। তার অন্তর কেঁদে ওঠে। রোগশীর্ণ কাসুর কান্না শুনতে পায় সে তার অন্তরে। স্পষ্ট দেখতে পায়, ঘুম থেকে জেগে কাসু মা-মা বলে কাঁদছে।

অসুখ ভালো হয়ে আসার পর প্রথম চোখ মেলেই সে মা-কে চিনতে পেরেছিল। তারপর যতক্ষণ সে জেগে থাকত, কখনো জয়গুনের বুকে মাথা রেখে, কখনো হাত আঁকড়ে ধরে থাকত। তার বিছানা ছেড়ে জয়গুনের কোথাও যাওয়ার উপায় ছিল না। সে কোথাও গেলে কাসু কান্না জুড়ে দিত। দুর্বল হাত-পা দিয়ে কাঁথা-বালিশ ছুঁড়তে আরম্ভ করত। আজও জয়গুন তার মনের চোখে দেখতে পায়—কাসু পায়ের লাথি মেরে গায়ের কাঁথা ফেলে দিচ্ছে। করিম বক্‌শ বা আঞ্জুমন কেউ তাকে শান্ত করতে পারছে না।

আসলেও তাই ঘটেছিল। করিম বক্‌শ নানা রকম লোভ দেখিয়েও কাসুর কান্না থামাতে পারেনি।

রমেশ ডাক্তার জয়গুনকে আনবার জন্যে লোক পাঠাতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি করিম বক্‌শের কাছে জানতে পারেন, জয়গুন আর আসবে না।

ডাক্তার তাঁর সুন্দর থার্মোমিটারটা কাসুর হাতে দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেটা সে মাটির ওপর ছুঁড়ে ভেঙে দেয়।

ডাক্তার করিম বক্‌শকে ভৎর্সনা করেন—শিগ্‌গীর ওকে ওর মা-র কাছে পাঠিয়ে দাও। এভাবে ওকে রাখতে পারবে না। এখনও শরীর দুর্বল। এক্ষুণি নিয়ে যাও। দেরী করো না। আমি ওখানে গিয়ে দেখে আসব। ঐ তালগেছো বাড়ীটা তো ? হ্যাঁ, চিনেছি। ওর মা-র কাছে ভালো থাকবে।

করিম বক্‌শ কাঁচুমাচু করে। ডাক্তারের আদেশ লঙ্ঘন করবার সাহস তার হয় না।

সে যখন কাসুকে কোলে করে নিয়ে যায়, তখন রোদের তেজ বেড়েছে। মাঠের আধা-পাকা মশুর, কলাই ও সর্ষের গাছে শিশির তখনও ঝলমল করছে।

করিম বক্‌শ কাসুকে এনে জয়গুনের ঘরের দরজার ওপর ছেড়ে দেয়। হাসু ও মায়মুন এসে কাসুর হাত ধরে ঘরে নিয়ে যায়। জয়গুন বসে আছে নিশ্চল। চোখের পানি শুকিয়ে তার দুই গালে দুটি রেখা স্পষ্ট হয়ে আছে। জয়গুন কাসুর দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় না, বলেও না কিছু মুখে। কাসু দু'হাত দিয়ে তাকে ধরতেই জয়গুন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। হাসু ও মায়মুন পাশে বসে কাসুর পিঠে ও মাথায় হাত বুলায়।

উঠানে করিম বক্শ দাঁড়িয়ে আছে। মায়মুনকে উঠানে একখানা পিঁড়ে দিয়ে আসতে বলে জয়গুন।

মায়মুন সসঙ্কোচে পিঁড়ে হাতে বাপের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

করিম বক্শের মমতাহীন লাল চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। হাত বাড়িয়ে মায়মুনকে ধরতে যায়। কিন্তু তার হাত কাঁপছে কেন? মেহেরুনকে হত্যা করবার সময় যে হাত কাঁপেনি, মায়মুনসহ জয়গুনকে মেরে তাড়িয়ে দেওয়ার সময় যে হাত তার বিচলিত হয়নি, আজ সেই হাত কাঁপছে কেন? সেই হাতের শক্তি কোথায়? নিজের মেয়েকে স্পর্শ করবার শক্তিও যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। মায়মুনকে স্পর্শ করবার অধিকার যেন হারিয়েছে সে।

করিম বক্শের হাতটা আপনার থেকেই নেমে আসে। মাথা নিচু করে সে বাড়ীর দিকে পথ নেয়।

শফীর মা জ্বরের শরীর নিয়ে লাঠি ভর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে আসে। বলে—আহা, হুকাইয়া এক্কেরে কাষ্ট অইছে মানিক। খালি আড়গুলা আছে।

—আড় বাঁইচ্যা থাকলে মাংস একদিন অইবই। কাসুর চুলে আঙুল চালাতে চালাতে জয়গুন বলে।

—হ, আল্লায় বাঁচাইয়া রাখুক। আমার যত গাছ চুল আছে, তত বচ্ছর আয়ু যেন খোদায় ওরে ছায়।

করিম বক্শ এখন রোজ আসে কাসুকে দেখতে। কোনদিন মাঠের মাঝ দিয়ে তাকে আসতে দেখে কাসু আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ঝোপের আড়ালে বসে থাকে যতক্ষণ না করিম বক্শ চলে যায়। তার ভয়—করিম বক্শ তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই আসে। তার এ বিশ্বাসে ইন্ধন যোগায় মায়মুন। রোজ ভোরে সে পথের দিকে চেয়ে থাকে। করিম বক্শকে দেখতে পেলেই সে হুঁশিয়ারী সঙ্কেত দেয়। করিম বক্শ ব্যর্থ হয়ে শফীর মা-র ঘরে গিয়ে কথাবার্তা বলে। তার ছেঁচা পানে ভাগ বসায়।

—কি করলা, ভাজ? পরস্তাবডা করছিলা? করিম বক্শ জিজ্ঞেস করে।

—করছিলাম। কিন্তুক রাজী অয় না। বহুত দিন ধইর‍্যা আমিও চেষ্টা করতে আছি। ঢক-চেহারায় তো কম না। মাইনষে ছাখলে এহনও এক নজর চাইয়া ছাহে। যাইডের বান্দে ছান্দেও ঠিক আছে। এহনও নিকা দিলে গণ্ডায় গণ্ডায় বাচ্চা-কাচ্চা অয়। আমি এত কইর‍্যা বুঝাই, আমার কতা কানেই নেয় না। গদু পরধান কত ঘুরাঘুরি করে! দুই কানি জমিন আর একখান ঘর লেইখ্যা দিতে চাইছিল।

—আমি ভালার লেইগ্যা কইছিলাম! আমার সংসারও চলত, আর

আমার পোলা মাইয়াও সুখে থাকত। আমার তিন কানি জমিন ওর নামে দলিল রেজেষ্টি কইর্যা লেইখ্যা দিতাম। তুমি আর একবার কইয়া ছাইখ্য না। যদি সতীনের ঘর করতে রাজী না অয়, তয় আঞ্জুমনরেও তালাক দিয়া দিতে পারি। এর বেশী আর কি চায়?

—কিন্তুক ও যে কিচ্ছুই চায় না। আমার মোখের উপ্রে কইয়া দিছে,—'যেই থুক একবার মাডিতে ফালাইছি, তা মোখ দিয়া চাট্তে পারতাম না।'

করিম বক্শ এবার ফতুয়ার পকেট থেকে একটা পান বের করে শফির মা-র হাতে দিয়ে বলে—খবরদার কেউ যেন না জানে। তোমার ঘরে ডাক দিয়া এই পানডা খাওয়াইয়া দিও। নাগর বাইগ্গার আতে পায়ে ধইর্যা এইডা যোগাড় করছি। বান্দরের নউখের কলম আর মানিক জোড়ের রক্ত দিয়া এই পানের উপরে লেইখ্যা দিছে আর কইয়া দিছে,—'সাত রোজের মইধ্যে যদি ও তোমার লেইগ্যা পাগল না অয় তো আমার নামে কুত্তারে ভাত দিও।'

আঠারো

—কারা ওইখানে? কেডা, কেডারে? শফীর মা চেঁচিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।—খবরদার, ফলগাছে কোপ দিলে আজগাই ঠাডা পড়ব মাতায়, কইয়া রাখলাম।

কে একজন বলে—আমরা কিনছি এই গাছ। জিগাও গিয়া হাসুর মা-রে।

শফীর মা রাগে গরগর করতে করতে আসে—অ্যাই হাসুর মা, টিয়াঠুইট্যা আমগাছটাও বেচ্ছস?

—হ্, গফুর শেখ নিছে ওডা, দশ ট্যাকায় লাকড়ির লেইগ্যা।

—ওহুঁ, যেই নেউক, ঐ গাছ আমি কাটতে দিতাম না।

ক্যাঁ? ঐ গাছ তো আমার ভাগের।

—ঐ গাছ তোর তা মুল্লুকের মাইনষে জানে। কী সোন্দর আম অইছে গাছটায়। জষ্টি মাসে পাকব। তুই এই গাছ বেচ্লি কোন্ আক্কেলে? বাচ্চা-কাচ্চারা কি মোখে দিব?

এক সঙ্গে অনেকগুলো কথা চেঁচিয়ে বলে শফীর মা হাঁফিয়ে ওঠে।

—কি মোখে দিব আবার? আগে ভাত খাইয়া বাঁচলে তারপর তো আম-জাম।

শফীর মা ভেঙচিয়ে ওঠে—তারপর তো আম-জাম! আমের দিনে বেবাকে আম খাইব, আর ওরা মাইনষের মোখের দিক্ চাইয়া থাকব। কর যা তোর মনে লয়। তুই গলায় দড়ি দিলেও আর আমি না করতাম না।

—দুইদিন বাদে গলায় দড়িই দিতে অইব। কি করতাম আর! তোমরাই হে-সুম ধইর‍্যা-বাইন্দা তোবা করাইলা। ঠ্যাং ভাইঙ্গা কত দিন ধইর‍্যা বইস্যা আছি। একটা না, দুইডা না, চাইরখান প্যাডের ভাত আহে কই তন?

শফীর মা ক্ষুব্ধ হয়ে নিজের ঘরে চলে যায়। বাড়ীর দক্ষিণ পাশ থেকে গাছ কাটার শব্দ আসে। জয়গুনের বুকের ভিতরেও যেন কুঠারের আঘাত পড়ছে বারবার।

টিয়াঠুঁটে আম গাছটায় আম ধরেছিল এবার খুব। আমও জাতের আম। দুধে মেশালে দুধ নষ্ট হয় না. এত মিষ্টি। আমের তলার দিকটা টিয়ার ঠোঁটের মত বাঁকা। আর পাকলে ঐ ঠোঁটটাই শুধু লাল হয়।

হাসু ও মায়মুন গাছে বোল দেখে কত খুশী হয়েছিল! আর একটা মাস রয়ে সয়ে বেচলে ওরা খেতে পারত। কিন্তু এদিকে পেট তো আর ক্ষুধার জ্বালায় 'র' মানবে না।

করিম বক্শ দুধের হাঁড়ি মাথায় উঠানে এসে ডাকে—কাসু!

কাসু ততক্ষণে পিছ-দুয়ার দিয়ে পালিয়েছে।

আরো দু-তিন ডাক দিয়েও যখন কাসুর সাড়া পাওয়া যায় না, তখন সে মায়মুনকে ডাকে—একটা ঘডি লইয়া আয় মায়মুন।

জয়গুনের একবার বলতে ইচ্ছে হয়—আমরা দুধ খাই না। লইয়া যান দুধ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বলা হয় না।

মায়মুন ঘটি নিয়ে আসে।

করিম বক্শ এক সের দুধ ঘটিতে ঢেলে দিয়ে বলে—রোজ এমুন সুম আমি দুধ দিয়া যাইমু। আমাগ ধলা গাইডা বিয়াইছে। কাসুব ভাগ্যে একটা দামড়ি বাছুর অইছে। বাছুরডা ঘাস ধরলে কাসুরে দিয়া যাইমু। কাসু কই গেছে রে?

মায়মুন উত্তর দেয়—পলাইছে।

করিম বক্শ আর দাঁড়ায় না। যেতে যেতে একবার পেছনে তাকায়। জয়গুনের চোখে চোখ পড়তে লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

জয়গুন ধমক দেয় মায়মুনকে—দুধ রাখলি, খাইব কে?

—ক্যা? আমরা।

—হ, তোরা-ই খা। আমি ছুঁইতাম না ঐ দুধ।

সকলকে চমকে দিয়ে টিয়াঠুঁটে আম গাছটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। দু' একটা পাখীর আর্তচীৎকার ভেসে আসে পাশের ঝোপ থেকে।

নাবিক সিন্দাবাদের ঘাড়ের ওপর এক দৈত্য চেপে বসেছিল। বাঙলা তেরোশো পঞ্চাশ সালের ঘাড়েও তেমনি চেপে বসেছিল দুর্ভিক্ষ। হাত-পা শেকলে বাঁধা

পরাধীন সে বুভুক্ষু তেরোশো পঞ্চাশের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে তার পরের আরো চারটি উত্তরাধিকারীর। কিন্তু দুর্ভিক্ষ আর ঘাড় থেকে নামেনি। ঘাড় বদল করেই চলেছে একভাবে। হাত-পায়ের বন্ধনমুক্ত স্বাধীন তেরোশো পঞ্চান্নে এসেও সে আকাল-দৈত্য তার নির্মম খেলা খেলছে। তাকে আর ঘাড় থেকে নামানো যায় না।

দেশে চালের দর কুড়ি টাকার নিচে নামে না বছরের কোন সময়েই। ফাল্গুন মাস থেকে সে দর আরো চড়ে যায়। চড়ে যায় লাফিয়ে লাফিয়ে। চল্লিশ টাকায় গিয়ে ঠেকে। আউশ ধান ওঠার আগে এই দর আর নামে না। ফলে যারা টেনেটুনে দু'বেলা খেত, তারা এক বেলার চালে দু'বেলা চালায়। ফেনটাও বাদ দেয় না, ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে দুধ-ভাতের মত করে খায়। যারা দু'বেলা আধ-পেটা খেয়ে থাকত, এ সময়ে তারা শাক-পাতার সাথে অল্প চাল দিয়ে জাউ রেঁধে খায়। ক্ষুধিতের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যায়। পেটের জ্বালায় ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে অনেকে। আশা—দশ দুয়ারে মেগে এক দুয়ারে বসে খাবে। কিন্তু দশের দশা শোচনীয়। সমস্ত দেশ দিশেহারা। দুর্ভিক্ষে কে দেয় ভিক্ষে?

এ পৌনঃপুনিক দুর্ভিক্ষ শুধু কি ভাতের? কাপড়েরও। শত কপাল কুটলেও সরকার-নিয়ন্ত্রিত মূল্যের দ্বিগুণ দিয়েও একখানা কাপড় পাওয়া যায় না। অনেকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়ে দেয় একই কাপড়ে। তালি খেয়ে খেয়ে ময়লা জমে-জমে ভারী হয়ে ওঠে সে কাপড়। বৃষ্টি ও ঘামে ভিজে বিদঘুটে বোটকা গন্ধ ছড়ায়।

জয়গুন অনেক ভেবেছে ভাত কাপড়ের ভাবনা। কিন্তু হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে বসে এ ভাবনার অর্থ নেই, সে হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। মায়মুনের বিয়ের সময়, ছ'মাস আগে তওবা করে সেই যে ঘরে ঢুকেছে আজ পর্যন্ত সেই তওবার অমর্যাদা সে করেনি।

—কিন্তু এমনি করেই কি আর দিন চলবে? এমনি করেই কি পেটের জ্বালা জুড়াবে? কাপড় জুটবে পরনের? জয়গুন প্রশ্ন করে নিজেকে।

পেটের জ্বালা এদিকে বেড়েই চলছে দিন দিন। দুই দিন এক রকম কিছুই খাওয়া হয়নি।

কাল রাত্রে খাওয়ার সময় কাসু জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি খাইবা না, মা?

—আমি রোজা আছি। তোরা খাইয়া ওঠ্। তোর ব্যারামের সময় মানৃতি করছিলাম তিনডা রোজা রাখতাম বুইল্যা।

—রাইতেও খাইবা না তুমি? মায়মুন বলে।

—এই রোজায় দিন-রাইত না খাইয়া থাকতে অয়।

কাসু বিশ্বাস করলেও হাসু ও মায়মুন বিশ্বাস করেনি সে কথা। নিজের পাতের কয়েক মুঠো ভাত হাঁড়িতে তুলে রেখে হাসু উঠে গিয়ে বলেছিল—আইজ ভুখ্ নাই মা।

হাসুর দেখাদেখি মায়মুনও থালার ভাত রেখে বলে—আমারও ভুখ্ নাই। দু'দিনের মধ্যে সে ভাত ক'টাই পেটে দিয়ে আছে জয়গুন।

বাড়ীর আম গাছ, তেঁতুল গাছ, ঝাড়ের বাঁশ কেটে 'ছাপ্লোনছাড়া' করে দেয়া হয়েছে। চারটে 'আণ্ডালু' হাঁস বিক্রি করে দিয়েছে। বিক্রি করবার মত আর কিছুই নেই।

বিকেল হলেই কাসু খেলা ছেড়ে মা-র আঁচল ধরে তার পিছু পিছু ঘুরতে থাকে, তাগিদ দেয়—ভাত রানবা না, মা? আমার ভুখ্ লাগছে। এই ছাহ না প্যাটটা কেমুন ছোড অইয়া গেছে।

কাসু হাত দিয়ে পেটটা দেখায়। জয়গুন দেখে, সত্যি পেটটা নেমেই গেছে। সে ফাঁকি দিয়ে বলে—তোর মিয়াভাই মাছ আনলে তারপর পাক করমু। নিত্যি নিত্যি শাক-পাতা ভাল্ লাগে না।

—কি মাছ, মা? ইলশা মাছ?

—হ, ইল্‌শা মাছ।

কাসু খুশী হয়।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। হাসু এখনও এলো না। জয়গুন কাসুকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে মায়মুনকে বলে—মায়মুন, ওরে লইয়া যা। ঝিঁঝি ধইর‍্যা দে গিয়া। ঐ ছাখ, হোন কেমুন ডাকে।

দুটো নারকেলের আঁইচা যোগাড় করে কাসুকে নিয়ে মায়মুন শফীদের ঘরের ছাঁচতলায় যায়। দু'হাতে আঁইচা দুটো নিয়ে ঠুকতে আরম্ভ করে—ঠরর্ ঠরর্।

এ রকম শব্দে ঝিঁঝি পোকা আকৃষ্ট হয়! জঙ্গল থেকে বেরিয়ে শব্দকে কেন্দ্র করে উড়তে থাকে। যখন হাতের কাছের কোন কিছুর ওপরে বসে, তখন ধরতে বেগ পেতে হয় না।

নিজের অসামর্থ্যের জন্য অবুঝ ছেলের কাছেও লজ্জিত হয় জয়গুন। পেটের ছেলে, তবুও নিজেদের দৈন্য ঢেকে রাখবার চেষ্টা করে সে সব সময়। হাসু ও মায়মুনকে কম করে খেতে দিলেও কাসুকে খেতে দিতে হয় পুরো। যেন সে অভাবের কথা জানতে না পারে।

কাসু হাঁড়ির খবর জানে না। জানবার বয়সও তার নয়। তা ছাড়া জানবার মত কোন কারণও জয়গুন ঘটতে দেয়নি আজ পর্যন্ত।

জয়গুন শুনতে পায় নারকেলের আঁইচা বাজিয়ে মায়মুন ও কাসু ঝিঁঝি ধরার ছড়া গাইতে শুরু করেছে:

ঝিঁঝি লো, মাছি লো,
বাঁশতলা তোর বাড়ী,
সোনার টুপি মাথায় দিয়া
রূপার ঝুমুর পায়ে দিয়া
আয়-লো তাড়াতাড়ি।
ঝিঁঝি ঝিঁঝি করে মায়,
ঝিঁঝি গেছে সায়বের নায়,
সাতটা কাউয়ায় দাঁড় বায়,
ঝিঁঝি লো তুই বাড়ীত্ আয়।
ঝিঁঝির বাপ মরছে্
কুলা দিয়া ঢাক্‌ছে,
ঝিঁঝির মা কানছে,
আয়-লো ঝিঁঝি বাড়ীত্ আয়।

কিন্তু এ রকম ফাঁকি দিয়ে আর কত দিন? কাল রাত পোহালেই যখন এক মুঠো ভাত দিতে পারবে না ছেলের মুখে, তখন কি এ অভাবের কথা গোপন থাকবে ছেলের কাছে? ক্ষুধায় অস্থির হয়ে যখন সে 'ভাত ভাত' করে চীৎকার করবে, তখন মা হয়ে কি জবাব দেবে সে? জবাব না পেয়ে সে কি তখন বুঝবে না যে, তার মা অপদার্থ, খেতে দিতে পারে না। জয়গুন ভাবে এ সব কথা। এ ভেবে আরো ব্যথিত হয় যে পেট ভরে খেতে দিতে না পারলে কাসুর কাছে তার বুকভরা স্নেহের কোন দামই আর থাকবে না। ছেলের আস্থা থাকবে না মা-র ওপর। মা-র স্নেহের ছায়ায় আসবার জন্যে একদিন সে অস্থির হয়ে উঠেছিল। এবার ক্ষুধার তাড়নায় করিম বক্‌শের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্যে সে অস্থির হয়ে উঠবে আবার।

সন্ধ্যার পর তিনপো চাল গামছায় বেঁধে হাসু বাড়ী আসে।

জয়গুন চোখ টিপে হাসুকে জিজ্ঞেস করে—মাছ কই হাসু? তোকে না কইছিলাম, ইল্‌শা মাছ আন্‌তে?

হাসু কথার ধরন বুঝতে পেরে বলে—ইলশা কাতলা কোন মাছই পাইলাম না বাজারে। মাছ মোড়ে নাই।

দু'দিনের না-খাওয়া জয়গুনের বুকের ভেতর ধড়ফড় করে। পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে মাঝে মাঝে, যেন নাড়ি-ভুঁড়িগুলোও হজম হয়ে যাচ্ছে। চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে আসে। গামছায় বাঁধা চাল দেখে তার ক্ষুধা আরো বেড়ে যায়।

জয়গুন সমস্তটা চাল নিয়ে হাঁড়ি বসায় আজ। ভোরের জন্যে রেখে দেয় না কিছুই। এই বেলা খেয়ে কিছু যদি বাঁচে তবে ছেলে-মেয়েরা পান্তা ভাত

খেতে পাবে ভোরে। কিন্তু সে আশা কম। তার মনে হয়, একাই সে তিনপো চালের ভাত খেতে পারবে এখন।

কচুর লতির চচ্চড়ি ও ডাঁটা শাক দিয়ে পরম তৃপ্তির সঙ্গে ভাত খায় সকলে। অনাহারে শুক্‌নো বুকে ভাত ঠেকে জয়গুনের। বারবার পানি খেয়ে সে বুক ভিজিয়ে নেয়।

জয়গুন বলে হাসুকে—কি চাউল রে! ফেনডা যে ঘাডের পানি মতন। আবার চুকা। দেইখ্যা আনতে পারস না?

—চাউল পাওয়া যায় না বাজারে, তার আবার দেইখ্যা আন্‌মু। কত কষ্টে এই চাউল যোগাড় করলাম। বারো ছটাক বারো আনা। কাইল বাজারে ঢোল দিছিল ম্যাজিস্টর সাব—নয় আনার বেশী এক সেরের দাম নিলে জরিমানা অইব। এই-এর লেইগ্যা বাজারে চাউল নাই। মহাজনরা গোলায় গুঁজাইয়া থুইছে চাউল।

খাওয়ার শেষে হাঁড়িতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

ছেলে-মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে সকাল সকাল। দু'দিনের অনাহারের পর ভাত খেয়ে জয়গুন আরো শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আজ তার শরীর ঝিমঝিম করে। চোখ দিয়ে পানি ঝরে শুধু শুধু।

জয়গুন বসে বসেই এশার নামজ শেষ করে। প্রতিদিনের মত তসবীহ নিয়ে জপতে আরম্ভ করে। কিন্তু সকল কাজের মধ্যে ঐ এক চিন্তা - কাল রাত পোহালে ছেলে-মেয়েরা মুখে কী দেবে? হাসু কী খেয়ে কাজে যাবে? কাসুর কাছে কৈফিয়ত দেওয়ার কিছু নেই।

জয়গুনের উত্তরে চাল কিনতে যাওয়ার সাথী লালুর মা দু'দিন এসেছিল। অনেক সাধাসাধি করেছিল ফতুল্লার ধান কলে কাজ করবার জন্যে। কিন্তু জয়গুন তওবার কথা ভোলেনি। হাত পায়ে যে শিকল সে পরেছিল সেদিন, তা খুলবার সাহস তার নেই। শক্তি সে পায় না। নিতান্ত অসহায়ভাবে সে লালুর মা-র প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আজ লালুর মা-র বলা কয়েকটি কথা বারবার তার মনে আসে। সে বলেছিল—না খাইয়া জানেরে কষ্ট দিলে খোদা ব্যাজার অয়। মরলে পরে খোদা জিগাইব, তোর আত-পাও দিছিলাম কিয়ের লেইগ্যা? আত দিছিলাম খাটবার লেইগ্যা, পাও দিছিলাম বিদ্যাশে গিয়া ট্যাকা রুজি করনের লেইগ্যা।

লালুর মা কথায় কথায় গ্রাম্যগীতের কয়েকটা লাইনও গেয়ে উঠেছিল সেদিন:

আত আছিল, পাও আছিল,
আছিল গায়ের জোর,
আবাগী মরল ওরে
বন্দ কইর‍্যা দোর।

কথাগুলো আজ তার নতুন অর্থ, নতুন ব্যাখ্যা নিয়ে জয়গুনের চিন্তাকে নাড়া দেয়। লালুর মা-র প্রস্তাবকে সে বারবার বিবেচনা করে দেখে। ধান কলের কাজ এমন কিছু নয়। ধান ঘাঁটা, ধান রোদে দেয়া, চাল ঝাড়া—এই সব কাজ। রোজ পাঁচ সিকা করে পাওয়া যায়। তা ছাড়া খুদ-কুঁড়াও পাওয়া যায় চেয়ে-চিন্তে।

মনের দুই বিরোধী চিন্তার সংঘর্ষের মধ্যে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

মশার কামড় খেয়ে মায়মুন হাত-পা নাড়ছে। জয়গুন তাকায় ঐ দিকে। হাসু বেঘোরে ঘুমুচ্ছে। সারাদিন খেটে তার আর হুঁশ নেই। মশার কামড়েও তার ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। কাসু তার মিয়াভায়ের গলা ধরে তার গায়ের ওপর একখানা পা চড়িয়ে দিয়ে ঘুমুচ্ছে। কুপির অস্পষ্ট আলোকে ছেলেমেয়েদের দিকে সে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তাদের কচি মুখ জয়গুনকে তার পথের সন্ধান বাতলে দেয়, তওবার কথা সে ভুলে যায়। লালুর মা-র প্রস্তাব মাথায় নিয়ে কাল যাবে সে ধান কলে কাজ করতে। হাতে পায়ে তাকত থাকতে কেন সে না খেয়ে মরবে? ক্ষুধাব অন্ন যার নেই, তার আবার কিসের পর্দা, কিসের কি?

জয়গুন বুঝেছে, জীবন রক্ষা করাই ধর্মের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মূলমন্ত্র। জীবন রক্ষা করতে ধর্মের যে কোন অপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সে প্রস্তুত। উদরের আগুন নিবাতে দোজখের আগুনে ঝাঁপ দিতেও তার ভয় নেই।

জয়গুন সুঁই-সূতা নিয়ে কাপড় সেলাই করতে বসে। কাপড়টা অনেক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। এ কাপড় নিয়ে বেরোবার উপায় নেই। হাসুর গামছা বুকে জড়িয়ে গায়ের আঁচলটা আগে সেলাই করে। সেটা শেষ হলে বাকী আঁচলটা সেলাই করে তারপর।

ভোর হয়। ঘুম থেকে জয়গুন ওঠে নতুন প্রাণ, নতুন উদ্যম নিয়ে।

শফীর মা-র কাছ থেকে চাল ধার করে রান্না হয়। ছেলেমেয়েকে খাইয়ে, নিজে খেয়ে জয়গুন বেরিয়ে পড়ে।

ধান খেতের আল ধরে পথ চলে জয়গুন। হাঁটু-সমান উঁচু ধান গাছ ভরা মাঠ। যেন সবুজ দরিয়া। ঝিরঝিরে বাতাস ঢেউ-এর নাচন তোলে। ছড়িয়ে দেয় মাঠের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। দূর-প্রসারী মাঠের দিকে তাকিয়ে জয়গুনের চোখ জুড়ায়।

খেতের কাজে ব্যস্ত চাষীরা তাকায় জয়গুনের দিকে। কিন্তু তার ভ্রূক্ষেপ নেই। গদু প্রধান তার খেত তদারক করছিল। সকলের অলক্ষ্যে সে মাথা নাড়ে আর বলে—তোরে শাসন করতে পারতাম না! আমার নাম গদু পরধান। এট্টু সবুর কর।

উনিশ

সূর্য-দীঘল বাড়ীর ভূত ক্ষেপেছে।

রাতে জয়গুনের ঘরের বেড়া ও চালের ওপর ঢিল পড়তে শুরু করে। হাসু কাসু ও মায়মুন চীৎকার করে ওঠে, শেষে গলা দিয়ে চীৎকারও বের হয় না। ভয়ে তারা মা-কে জড়িয়ে ধরে।

ওদিকে শফীর মা-র চীৎকার শোনা যায়।

পরের দিন ভোরে সে বলে—হেসুম কইছিলাম পাহারা বদলাইতে। অখন ছ্যা—খ্‌ কি দশা অয়! গাছগুলা কাটতে মানা করছিলাম। কোন্ গাছে কি আছিল, কে জানে? ওগ বাসা ভাইঙ্গা দেওনে রাগ অইছে।

পরের রাত্রেও এমনি ঢিল পড়ে। গ্রামে এই নিয়ে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। সূর্য-দীঘল বাড়ীর কাছ দিয়ে আর কেউ হাঁটে না।

গ্রামের বুড়ো সোনাই কাজী বলে—স্যুর্য-দীগল বাড়ীর ভূত ক্ষেপছে, আর উফায় নাই। স্যুর্য-দীগল বাড়ীতে মানুষ উজাইতে পারে না, বুড়া বুড়ীর কাছে হুনছি। স্যুর্য-দীগল হাটেরও উন্নতি অয় না। আমার চখখেই ছ্যাখলাম, জলধর কুণ্ডু কুণ্ডেরচরে হাট মিলানের লেইগ্যা কত ট্যাকা খরচ করল। কত হরিলুট দিল। ব্যাপারীগ মিডাই খাওয়াইল, নট্ট কোম্পানীর যাত্রা গানেও দুই এক হাজার ট্যাকা খরচ করছিল। কিন্তু কই? হাট আর মিলাইতে পারল না।

থুথুরে বুড়ী হনুফা বিবি বলে—আমার মামু একবার স্যুর্য-দীগল মৌপোকের বাসা ভাঙছিল। আমার মনে আছে। গাছের তন নামতে না নামতে আঁড়ির তলা ভাইঙ্গা মধু পইড়্যা গেল। কী তেজ! বাপ্পুসরে!

জয়গুন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে রাত্রে শফীর মা-র ঘরে আশ্রয় নেয়। ছেলে-মেয়েদের বুকে নিয়ে সারারাত 'আল্লা আল্লা' করে।

অমাবস্যার রাত। করিম বক্‌শ গালে হাত দিয়ে কুপীর সামনে বসে ভাবছে। তার মনের চোখে ভাসে—জয়গুনের ঘরে ঢিল পড়ছে দাড়ুম-দুড়ুম। তার বুকে কাসু ও মায়মুন ভয়ে মিইয়ে গেছে। হাসু পাশে বসে বসে কাঁপছে চোখ বন্ধ করে। জয়গুন আর একা এদের সামলাতে পারছে না। করিম বক্‌শের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে তার চোখের অব্যক্ত ভাষায় সে যেন সাহায্য চাইছে তার কাছে।

করিম বক্‌শ গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। তাকের ওপর থেকে চারটে গজাল নিয়ে গামছায় বাঁধে। জোবেদ আলী ফকিরের নির্দেশমত আজ এই অমাবস্যার দুপুর রাতে সূর্য-দীঘল বাড়ীর চার কোণে মন্ত্রসিদ্ধ গজাল ক'টা পুঁতে আসতে হবে তাকে।

সূর্য-দীঘল বাড়ী ঠিক-ঠাক করে জোবেদ আলী ফকির সেই যে একটি

পেতলের কলসী দাবী করেছিল, আজ পর্যন্ত তাকে দেয়া হয়নি সে কলসী। বছর বছর পাহারা বদলাবার কথাও সে বলেছিল। তাতেও কান দেয়নি জয়গুন ও শফীর মা। এ জন্যে গোস্বা হয়ে সে করিম বক্শকে জানিয়েছিল—এইবার দেখুক মজাখান। সাত দিনের মধ্যে বেবাক মিস্‌মার অইয়া যাইব। করিম বক্শ একটা পেতলের কলসী কিনে দিয়ে এবং অনেক হাতে-পায়ে ধরে জোবেদ আলী ফকিরের রাগ মাটি করেছে।

ফকির গজাল কয়টায় ফুঁ-ফাঁ দিয়ে তুকতাক করে করিম বক্শের হাতে দিয়ে বলে—পরশু অমাবইস্যা। রাইত দুফরের পর—। চাইর কোণে চাইড্ডা—

—আমার ডর করে যে! একলা যাইতে সাবাসে কুলায় না। করিম বক্শ বলে।

—ডর করে! কও কি?

একটু চিন্তা করে ফকির বলে—আইচ্ছা, হেই দাওয়াইও আছে।

কারিম বক্শের কাঁধে দুই হাত রেখে ফকির টানা সুরে মন্ত্র পড়ে—

খাটো কাপড় উলট বেশে
বাণ মারলাম হেসে হেসে।
সেই বাণে মেদিনী কাঁপে,
জল কাঁপে, থল কাঁপে,
চান কাঁপে, তারা কাঁপে,
পাতালে বাসুকী কাঁপে,
আগে ভাগে ভূত-পেরেত,
জিন ভাগে শেষে।
কালা বাণে ভূত মারলাম,
পেত্নী বানলাম কেশে।

মন্ত্র পড়ে করিম বক্শের বুকে ও চোখে সাতবার ফুঁ দিয়ে ফকির এবার বলে—ডরের মাজা ভাইঙ্গা দিছি। যাও এইবার, আর ডর নাই। পরশু রাইত দুফরের পর, মনে থাকে যেন। চাইর কোণায় চাইড্ডা—

চারটি গজাল—বাড়ীর চার পাহারাদার। ঠিকে-ঠাকে বসিয়ে আস্‌তে পারলে ভূত-পেত্নীর দৌরাত্ম্য আর থাকবে না।

কুপি নিবিয়ে করিম বক্শ লাফ দিয়ে ঘর থেকে বেরোয়। সে পা ফেলে জোরে, আরো জোরে। কালো রাত্রির জমাট অন্ধকার যেন ভয় পেয়ে তার চলার পথ ছেড়ে দেয়।

ঈশান ও বায়ু কোণে দুটি গজাল পুঁতে সে পশ্চিম দিকে চলে আসে। ঘন অন্ধকার। তার মাঝেও দৃষ্টি চলে করিম বক্শের।—তিনটা ছায়ামূর্তি! ভয়ে তার গায়ের রোম কাঁটা দিয়ে ওঠে। সূর্য-দীঘল বাড়ীর তালগাছের

তলায় সে থমকে দাঁড়ায়। কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ে মাটিতে।

ছায়ামূর্তিগুলো ঢিল ছুঁড়ছে আর তারই দিকে সরে সরে আসছে। করিম বক্‌শ একটা শব্দহীন চীৎকার করে ওঠে। বার কয়েক ঢিপ-ঢিপ করে হৃদযন্ত্রটা যেন বন্ধ হয়ে যায়। একটা মূর্তি আরো কাছে সরে আসে তার। করিম বক্‌শের গায়ে ধাক্কা লাগে লাগে। এবার করিম বক্‌শ চিনতে ভুল করে না। হৃদযন্ত্রটা আবার বার দুই ঢিপঢিপ করে চালু হয়ে যায়। হঠাৎ ঘাম দিয়ে তার ভয়ও কেটে যায়। সে দাঁড়ায়। পাশ থেকে থপ করে ছায়ামূর্তির একটা হাত চেপে ধরে—গদু পরধান! তোমার এই কাম !!……!!!

সূর্য-দীঘল বাড়ীর তালগাছের তলায় করিম বক্‌শের মৃতদেহ টান হয়ে পড়ে আছে। আশ-পাশ গ্রামের লোক ছুটে আসে দেখতে। মৃতের শরীরে কোথাও কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। সকলেই একমত—সূর্য-দীঘল বাড়ীর ভূত তার গলা টিপে মেরেছে।

যে হিম্মত বুকে বেঁধে জয়গুন এত দিন সূর্য-দীঘল বাড়ীতে ছিল, তা আজ খান্‌খান্ হয়ে যায় এ ঘটনার পরে।

আজ বারবার করিম বক্‌শের কথাই মনে পড়ে জয়গুনের। বেদনায় বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। দরদর ধারায় পানি ঝরে গাল বেয়ে। আহা বেচারা! জীবনে কাউকে ভালোবাসেনি। কারো ভালোবাসা পায়ও নি সে।

শফীর মা আগে আগে গাঠরি-বোচকা বাঁধে। জয়গুন জিজ্ঞেস করে—বাড়ী ছাইড়্যা কই যাইবা?

—আগেত সোনার মানিকগ লইয়া বাইর অ। খোদার এত বড় দুইন্যায় কি আর এট্টু জা'গা পাইতাম না আমরা?

ছেলে-মেয়েদের হাত ধরে জয়গুন ও শফীর মা বেরিয়ে পড়ে। মনে তাদের ভরসা—খোদার বিশাল দুনিয়ায় মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁই তারা পাবেই।

চলতে চলতে আবার জয়গুন পিছন ফিরে তাকায়। সূর্য-দীঘল বাড়ী! মানুষ বাস করতে পারে না এ বাড়ীতে। দু'খানা ঝুপড়ি। রোদ বৃষ্টি ও অন্ধকারে মাথা গুঁজবার নীড়। দিনের শেষে, কাজের শেষে মানুষ পশু-পক্ষী এই নীড়ে ফিরবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

ঐ উঁচু তালগাছ। অনেক কালের ঘটনার নীরব সাক্ষী ওটা।

তারা এগিয়ে চলে।

বহুদূর হেঁটে শ্রান্ত পা-গুলোকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্যে তারা গাছতলায় বসে। উঁচু তালগাছটা এত দূর থেকেও যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

আবার তারা এগিয়ে চলে…

★

শব্দ-পরিচিতি

সঙ্কেত

অব্য.—অব্যয়	ক্রি.—ক্রিয়া	বিণ.—বিশেষণ
আ.—আরবী।	তু.—তুর্কী	সর্ব —সর্বনাম
ইং.—ইংরেজী	প্রা.—প্রাকৃত	সং.—সংস্কৃত
উ.—উর্দু	ফা.—ফার্সী	হি.—হিন্দী
	বি —বিশেষ্য	

লেখ্যরূপ (সাধু) : লেখ্য ও কথ্যরূপ (চলিত)

[ ] তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে শব্দের ব্যুৎপত্তি বা জাতি নির্দেশ করা হয়েছে।

অইডা—ঐটা : ওটা। সর্ব.

অইব—হইবে : হবে। ক্রি.

অইবা—হইবে : হবে। ক্রি.

অইলা—হইলে : হলে। ক্রি.

অইলাম—হইলাম : হলাম। ক্রি.

অইলেও—হইলেও : হলেও।

অউয়ত—হওয়া, জন্মানো। ক্রি.

অউয়ত-মউয়ত—জন্ম-মৃত্যু। [আ. মওত থেকে মউয়ত] বি.

অউক—হউক : হোক। ক্রি.

অখুনি—এইক্ষণে : এখনি, এক্ষুণি ক্রি-বিণ. এই মুহূর্তে।

অজম—হজম, পরিপাক। বি. [আ. হদম্]

অড়কল—গলার অলঙ্কার বিশেষ। বি.

অতশত—অতপ্রকার। বিণ. ক্রি-বিণ.

অদিষ্ট— অদৃষ্ট, ভাগ্য, নিয়তি। ক্রি.

অম্বায়—অমনভাবে। ঐভাবে : ওভাবে।

অয়—হয়। ক্রি.

অর—উহার : ওর। সর্ব

অলক্ষী—অলক্ষুণে, কুলক্ষণযুক্ত, অপয়া। বিণ.

অহন—এইক্ষণ : এখন। ক্রি-বিণ.

আইচ্ছা—আচ্ছা, বেশ, ভালো, উত্তম। বিণ.

আইজ—অদ্য : আজ। অব্য. ক্রি-বিণ. বর্তমান দিনে।

আইছি- আসিয়াছি : এসেছি। ক্রি.

আইজগা—অদ্য : আজকে। অব্য.

আঁইচা—নারকেলের মালা। বি.

আঁইট্যা—হাঁটিয়া : হেঁটে। ক্রি.

আইতে—আসিতে : আসতে। ক্রি.

আইন্যা—আনিয়া : এনে। ক্রি.

আইয়া—আসিয়া : এসে। ক্রি.

আইল—আসিল : এল। ক্রি.

আইলে—আসিলে : এলে। ক্রি.

আক্কল—আক্কেল, বুদ্ধি, বিবেচনা। [আ. আকল] বি.

আঁড়ি—হাঁড়ি [সং. হণ্ডী] বি.

আঁস—হংস, হাঁস : হাঁস। বি.

আঁসা—হংস : হাঁসা, হাঁস। বি.

আঁসী—হংসী : হাঁসী। বি

আখা—উনান, চুলা, চুলো। [তু সং উখা—হাঁড়ি] বি.

আছিল—ছিল।
আজগাই—অদৃশ্য থেকে। বিণ.
[ফা. আ. আযগায়েব]
আজাব—শাস্তি। [আ.] বি.
আটি—গুচ্ছ। বি.
আড্ডি—হাড্ডি, হাড, অস্থি। বি.
আড়—হাড়। [সং. হড্ডি] বি.
আত—হস্ত, হাত : হাত। বি.
আদত—আসল। [সং আদিত ; তু. আ. আদদ] বিণ.
আদনা—সামান্য। [ফা. আদনা] বিণ.
অণ্ডালু—ডিম্ববতী, ডিম পাড়া। বিণ.
আ'বি—আসিবি : আসবি। ক্রি.
আলাই-বালাই—বিঘ্ন-বিপদ, আপদ-বালাই। [আ. বলা] বি
আ'লি—আসিলি : এলি। ক্রি.
আলীশান—শক্তিশালী, জবরদস্ত। [আ. ফা.] বিণ.
আলৈয়া—আলেয়া। বি.
আষ্ট—আট। [সং. অষ্ট] বি. বিণ.
আসমাইন্যা—আকাশচুম্বী। বিণ.
[ফা. আসমান বি.]
আস্তা—আস্ত, অভগ্ন গোটা। বিণ.
আহাল—আকাল, দুর্ভিক্ষ।
[সং. অকাল] বি.
আঁচি—হাঁচি। [সং. হঞ্চি] বি.
অ্যারে—ওরে (সম্বোধন-সূচক)। অব্য.
ইসাব—হিসাব : হিসেব।
[আ হিসাব] বি.
ইসাব-কিতাব—হিসাব-নিকাশ : হিসেব-নিকেশ। বি. আয়-ব্যয়ের বিবরণপত্র : বিচার-বিবেচনা।
উইটা—ঐটা : ওটা। সর্ব.
উইট্যা—উঠিয়া : উঠে। ক্রি.
উখ—ইক্ষু : আখ। বি.
উর মাডি—উর্বর মাটি।
উনা—ন্যূন, উনা : উনা, উনো। বিণ.
[সং. ঊন]
উন্নিশ-বিশ—উনিশ-বিশ, সামান্য পার্থক্য।
উফায়—উপায়, অভীষ্ট লাভের বা কার্যসাধনের পন্থা বা প্রণালী। বি.
উম—ওম. উষ্ণতা। বি
[সং উষ্ণ]
উলডা—উলটা : উলটো। বিণ.
[তু. হি. উল্লাট, প্রা. অল্লটে]
একপদ—এক প্রকার, এক রকম।
একই চোডে—একই চোটে, একই বারে, একই দফায়।
এক্কেরে—একেবারে, সম্পূর্ণরূপে।
এট্টু—একটু সামান্য। বিণ.
এডুক—এইটুকু : এটুকু। বিণ.
এতনা—এতটা। বিণ.
[হি. এতনা]
এম্বায়—এমনভাবে : এমনিভাবে।
ওইডা—ঐটা। সর্ব.
ওড—উঠ : ওঠ। ক্রি.
ওয়াতে—উহাতে, তাতে।
কইর‍্যা—করিয়া : করে। ক্রি.
কইলজা—কলিজা : কলজে। বি.
[হি. কলেজা] যকৃত।
কচুয়া—কচুপাতার রং ; সবুজ। বিণ.
কড়ু—কটু উগ্র কড়া। বিণ.
কড়ু তেল—কটু তৈল, সরিষার তৈল। সর্ষের তেল। বি.
[সং কটুক—রাজসর্ষপ]
কতডুক—কি পরিমাণ : কতটুকু।
কতা—কথা। বি.
কফাল—কপাল, অদৃষ্ট। বি.
কলডা—কলেরা, ওলাউঠা।
[ইং. Cholera]
কাচি—কাস্তে। বি.

কাটুম – কাটিব : কাটব। ক্রি
কাডা – কণ্টক : কাঁটা। বি. [সং. কণ্টক]
কাডায় কাডায় সত্য – কাঁটায় কাঁটায় সত্য ; সম্পূর্ণ রূপে সত্য।
কাডি – কাটি। ক্রি.
কাডি – কাঠি। বি.
কাড়্‌রিয়া – কাঠুরিয়া : কাঠুরে। বি.
কান্দে – কাঁদে, ক্রন্দন করে : কাঁদে। ক্রি.
কান কথা – কানে কানে বলা কথা, গোপন মন্ত্রণা। বি.
কালা – কালো। বিণ.
কাম – কর্ম : কাজ [সং. কর্ম]। বি.
কাম কামাই – কর্তব্য কর্মে অনুপস্থিত, কাজে অনুপস্থিত।
কামাই – কর্মের দ্বারা অর্জিত ধন। বি.
কিন্তুক – কিন্তু। অব্য.
কিয়ের – কিসের, কোন্‌ বস্তু বা বিষয়ের। সর্ব.
কিরপিন – কৃপণ : কৃপণ, কিপটে। বিণ. অত্যন্ত ব্যয়কুণ্ঠ।
কুকড়ি-মুকড়ি – ঘুমন্ত কুকুর মেকুরের মত কুণ্ডলিত। [মেকুর – বিড়াল]
কুছু – কিছু। [হি. কুছ]
কুট্টিকালে-শিশুকালে, শিশুবয়সে।
কুন্তু – কিন্তু। অব্য.
কুমুডি – কমিটি, কার্যনির্বাহক সমিতি। [ইং. কমিটি]
কেওর – কাহারও : কারো। সর্ব.
কেমিকল – নকল সোনা। বি. [ইং. Chemical]
কেমুন – কেমন, কি রকম : কেমন ক্রি-বিণ.
কেডা – কে ওটা, কোন ব্যক্তি : কে। সর্ব.
কোঁচ – মাছ বিঁধিয়ে মারার বহু ফলা যুক্ত অস্ত্র বিশেষ। বি.
কোতায় – কোথায়, কোন্‌স্থানে। অব্য.
কোনঠায় – কোনঠাইয়ে, কোনস্থানে।
কোস্তাকস্তি – কুস্তি লড়ার ভাব, মোচড়া-মুচড়ি, ধস্তাধস্তি [হি. কুস্তম কুস্তা]। বি.
কোহানে – কোন্‌স্থানে : কোথায়, কোন্‌খানে। অব্য.
ক্যা, ক্যান – কেন। অব্য.
ক্যাদা – কর্দম, কাদা। বি.
ক্যার – কাহার : কার। সর্ব. কোন ব্যক্তির।
ক্ষেতি – ক্ষতি, অনিষ্ট, লোকশান। বি.
খইয়া – খসিয়া : খসে। ক্রি.
খবরিয়া – সংবাদদাতা। বি. [আ. খবর থেকে]
খবরিয়া কাগজ – খবরের কাগজ, সংবাদপত্র। বি.
খ'র – খয়ের, খদির। বি.
খরাত – খয়রাত, ভিক্ষা। [আ. খয়রাত]
খাইমু – খাইব : খাব। ক্রি.
খাওয়ন – খাবার, খাওয়ার দ্রব্য। বি.
খাজুর – খর্জুর : খেজুর। বি. [সং. খর্জুর]
খাডাবি – খাটাবি, কার্যে নিয়োজিত করবি। ক্রি.
খাড় – দাঁড়া। ক্রি. [সং. খড়ক]
খাড়াকখাড়ি – অতি শীঘ্র, তাড়াতাড়ি, খাড়া থাকতে থাকতে। ক্রি.-বিণ. [সং. খড়ক থেকে উদ্ভুত]
খাড়ু – পায়ের অলংকার বিশেষ। বি.

খাদেম—সেবক। বি. [আ. খা'দিম]
খুদি—ভাঙা চাল, খুদ। বি. [হি. খুদি]
খেজমত—সেবা, পরিচর্যা। বি. [আ. খিদমত]
খোঁচ—মাটির ওপর লগি মারা। বি.
গত্ত—গর্ত, গহ্বর, ছিদ্র। বি.
গন্দভাদাল—গন্ধভাদুলী : গাঁধাল, গন্ধভাদাল। বি. [সং. গন্ধভদ্রা]
গাঙ - নদী। বি. [সং. গঙ্গা]
গিরধিনী—গৃধিনী, এক জাতীয় লাল কানযুক্ত শকুনি, গৃধ্রী। বি. [পুং. গৃধ্র]
গেরাম—গ্রাম, পল্লী। বি.
গ্যাদা - ছোট। বিণ.
ঘাড—ঘাট, অবতরণ স্থান। বি. [সং ঘট্ট]
ঘুইর্যা—ঘুরিয়া : ঘুরে। ক্রি.
ঘুটঘুইট্যা—ঘুরঘুট্টি। বিণ.
ঘুমডা—অবগুণ্ঠন, ঘোমটা। বি. [হি ঘুঙ্গট]
ঘেডি - ঘাড়, গ্রীবা [সং. ঘাট] বি.
চউখ—চক্ষু, চোখ। বি.
চক—বিস্তৃত মাঠ। বি [সং চতুষ্ক]
চরুয়া—যারা চরে বসবাস করে। বি.
চাইড্যা—চারিটা : চারটে, চাট্টে। বিণ
চাইর—চারি : চার। বি.
চাওয়াল—চাউল : চাল। বি. [হি.]
চাউল—চাউল : চাল। বি.
চাইঙ্গা - ঢিল, ঢেলা, চাঙরা। বি. [ফা. চাঙ্গ]
চান - চন্দ্র : চাঁদ। বি. [সং. চন্দ্র]
চাবায়—চর্বন করে : চিবায়, চিবোয়। ক্রি.
চালাক কর—জলদি কর, তাড়াতাড়ি কর।
চাঙ্গারি—বাঁশ বা বেত দিয়ে তৈরী ঝুড়ি বিশেষ।
চিক্কইর—চীৎকার, চেঁচানি। বি. [সং. চীৎকার]
চিটে—চিটা, চিটে, যে ধানের মধ্যে চাল নেই। বি.
চিল সত্বর—চিলের ছোঁ মারার মত তাড়াতাড়ি। ক্রি. বিণ.
চুকা—অম্ল, টক। বি. [সং. চুক্র]
চূর চূর্ণ। বি.
চেরাগ—প্রদীপ, বাতি। বি. [ফা. চিরাগ]
চ্যাবড়া—চেপটা। বিণ. [সং. চিপিট]
ছঙ্গে—সঙ্গে, সাথে।
ছল-চক্কর—ছল-চাতুরী। বি.
ছাইড়্যা—ছাড়িয়া : ছেড়ে। ক্রি.
ছাপ্পোনছাড়া—ছা-পোনাসহ বিতাড়িত বা ধ্বংস; বাচ্চা-কাচ্চাসহ ধ্বংস।
ছালাবুড়ী—যে বুড়ি ছেলে মেয়ে ধরে, ছালা অর্থাৎ বস্তার মধ্যে পুরে নিয়ে যায়, কাল্পনিক ডাইনী; জুজুবুড়ী। বি.
ছুরত—চেহারা, আকৃতি। বি. [আ. সুরত]
ছেঁইচ্যা—ছেঁচিয়া : ছেঁচে। ক্রি. থেঁৎলাইয়া।
ছেঁড়ি—ছুঁড়ী, ছুকরী। [সং. ছমণ্ডী]
ছোড—ছোট। বিণ.
ছ্যাঁড়া—ছোঁড়া, ছোকরা, বালক। বি. [সং. ছমণ্ড]
জননা—স্ত্রী, স্ত্রীলোক। বি. [ফা. যনানা]

জব – জবান, বাকশক্তি ; জবাব, উত্তর। বি. [ফা জবান— বাকশক্তি ; আ. জবাব উত্তর]

জমানা- যুগ, কাল। বি [আ যামানা]

জর্ম -- জন্ম। বি.

জাইত – জাত, সামাজিক শ্রেণী। বি. জাত খাওয়া— জাতিচ্যুত হওয়া।

জান ছালামতে—নিরাপত্তা ও শান্তিতে [ফা. জান, আ. সালামত]

জামাত—জনসমাবেশ। বি. [আ. জম্‌আ'ত]

জালি-- কচি। বি [সং. জালক]

জিগাইল—জিজ্ঞাসা করিল : জিজ্ঞেস করল। ক্রি.

জিকির-- উচ্চস্বরে মন্ত্র পাঠ। বি

জিরাইয়া-- জিরিয়ে, বিশ্রাম করে। ক্রি. [আ. জিরিয়ান—বিশ্রাম]

জিল্লিক—ঝিলিক, ক্ষণস্থায়ী আলোকচ্ছটা। বি.

জুম্মার ঘর– যেখানে জুম্মার নামাজ পড়া হয়, মসজিদ। বি.

জেরে-- শেষে, অবশেষে। [ফা. যের]

জোখা—মাপ। বি. [হি. জুখ]

জোতা—জুতা : জুতো। বি. [তু. হি. জুতা]

জোলইর‍্যা—জোলার তৈরী, তাঁতীর তৈরী। বিণ. [ফা. জুলহা থেকে জোলা]

ঝিমটি—ঝিমানি . ঝিমুনি। বি. তন্দ্রাবেশ, ঢুলুনি।

ঝিরকুইট্যা—ঝিকুট ; যা অকালে শুকিয়ে চিমড়ে হয়ে গেছে। বিণ.

ঝুডা—ঝুটা, জুঠা, উচ্ছিষ্ট। বিণ.

টাববুস—টাবুটুবু, টুবটুবে, পুরোপুরি ভরা। বিণ.

টিক্কাদার—টিকাদার, যে বসন্তাদি রোগের টিকা দেয়। বি.

টেরেন—ট্রেন, রেলগাড়ী। বি [ইং. ট্রেন]

টোক্কা - টোকা, টুসকি, আঙুলের ডগা দিয়ে আঘাত [সং. ছোট্টিকা] বি.

টোনা—পুরুষ বা স্ত্রীলোক বিশেষ করে স্বামী বস করার তন্ত্র-মন্ত্র (যাদু টোনা)। বি. [সং তন্ত্র ; হি. টোনা]

টোহা—টোকা দ্রষ্টব্য

ট্যাকা – টাকা, অর্থ। বি. [সং. টঙ্ক]

ট্যারা – বক্রদৃষ্টি, টেরা। বিণ. [সং টের ; তু. টেরে ; হি. টেঢ়]

ট্যাহা—টাকা। বি.

ঠনঠন—কিছুই নেই (বিদ্রুপাত্মক), ঠনঠন শব্দ শুনে বোঝা যায় পাত্র শূন্য। সে অর্থে কিছুই নেই বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অব্য.

ঠাডা—ঠাটা, বজ্র।

ঠুণ্ডা—ঠুঁঠা : ঠুটো [প্রা. টুঁটো ; হি. ঠুঁঠা] অক্ষম, অকর্মণ্য। বিণ

ঠোয়া—ফোস্কা, ঠোস। বি.

ঠ্যাঙ্গা—ঠেঙ্গা : ঠেঙা। বি. [হি. ঠেংগা]

ডর—ভয়, শঙ্কা, ত্রাস। বি. [হি. ডর ; সং. দর]

ডাঙর—ডাগর, বয়সপ্রাপ্ত, বড়। বিণ. [হি ডাবর]

ডানকানা—ছোট মাছ বিশেষ। বি.

ডাফ—ঘাই, পানির মধ্যে মাছের পুচ্ছাঘাত। বি.

ডুলি—দোলা, ছোট শিবিকা। বি. [সং. দোলা]

ডেগা—কচি, অপ্রাপ্তবয়স্ক। বিণ.

ডোর—সূতা (বড়শীর সূতা), রজ্জু। বি.

ঢক—চেহারা।

তক—পর্যন্ত, অবধি। অব্য. [হি.]

তক্তে—সিংহাসনে। বি [ফা. তখ্‌ত্‌]

তন—হইতে : থেকে। অব্য.

তরফখানা—ঝঞ্ঝাট, ঝামেলা বি.

তব—তাহা হইলে : তাহলে, তবে। অব্য.

তয়—তাহা হইলে : তা হলে, তবে। অব্য.

তয়তো—তাহা হইলে তো : তা হলে তো, তবে তো। অব্য.

তরশু—আগামী পরশুর দিন, গত পরশুর পূর্বদিন। ক্রি. বিন. [সং. তিরঃশ্বঃ]

তাকত - শক্তি, ক্ষমতা। [আ.]

তিতপুঁ ডি—ছোট পুঁটি মাছ যার স্বাদ তিতো। বি.

তিরিসীমানা—ত্রিসীমান। বি.

তিরুডি - ত্রুটি, দোষ। বি.

তুঁইতা—তুঁতিয়া : তুঁতে। [ইং. কপার সালফেট ; সং. তুত্থক] বি.

তুমড়িবাজি—তুবড়িবাজি, আতস-বাজি বিশেষ। বি

তোগ—তোদের। সর্ব.

তোবা—পাপ কাজ পুনরার না করার সংকল্প। বি [আ তওবা]

তোমাগ—তোমাদের। সর্ব.

থল—স্থল, ডাঙা। বি.

থুইয়া—রাখিয়া, রেখে। ক্রি.

থেইকা—হইতে, থেকে। অব্য.

দয়া অইছে—রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর দয়া হয়েছে, যেমন—ওলাবিবির দয়া হয়েছে—কলেরা হয়েছে ; মা শীতলার দয়া হয়েছে—বসন্ত হয়েছে।

দরমা—নলের বা বাঁশের চাটাই। বি. [হি] দরমা দরমা হয়ে গেছে—দরমার মত অমসৃণ হয়ে গেছে।

দাওয়াই—দাওয়া, ঔষধ। [আ]

দাড়াপথ—বর্ষার সময় ধানখেতের ভেতর দিয়ে নৌকা চলার পথ।

দিছে—দিয়াছে : দিয়েছে। ক্রি.

দিমুহনে—দিব এখন : দেবোখন। ক্রি.

দুইন্যায়—দুনিয়ায়, পৃথিবীতে। বি. [আ. দুনিয়া]

দুক্‌খু—দুঃখ। বি.

দুগায়ই—দুইটায়ই : দুটোতেই।

দুপৈরে - দ্বিপ্রহরে : দুপুরে।

দুফরে - দ্বিপ্রহরে : দুপুরে।

দেওনে - দেওয়ায় : দেয়ায়।

দেরেং—দেরি—বিলম্ব। বি. [ফা. দের]

দেহি—দেখি। ক্রি.

দ্যাড়—দেড়, এক ও আধ। বিণ.

দ্যাখ—দেখ্‌। ক্রি.

দ্যাশ—দেশ। বি.

দ্যাহ—দেখো। ক্রি.

দ্যাহা—দেখা। ক্রি.

ধইর‍্যা—ধরিয়া : ধরে। ক্রি.

ধলডোগ—ধলা অর্থাৎ সাদা বা সাদাটে ডগাযুক্ত। বিণ.

নওল—নবীন [ব্রজবুলি যেমন নওল কিশোর—নব কিশোর, কৃষ্ণ] নওল মুরগী—যে নবযৌবন প্রাপ্তা মুরগী এখনও ডিম পাড়েনি। বিণ.

নওশা—বর, বিবাহের পাত্র। বি. [ফা.]

নাইকল—নারিকেল : নারকেল। বি.

নাইব গোছল করিব, স্নান করিব : গোছল করব, স্নান করব

[হি. নহান থেকে] ক্রি.

নাইম্যা—নামিয়া : নেমে। ক্রি.

নাতি-নাতকুড়—নাতি-নাতিনী : নাতি-নাতনী। বি. পৌত্র-পৌত্রী দৌহিত্র-দৌহিত্রী।

নাবালেগ—অপ্রাপ্ত বয়স্ক। বিণ. [ফা নাবালিগ]

নাবীসঙ্গ—নাভির ওপর কোমর বেষ্টিত অলঙ্কার বিশেষ। বি.

নালে—না হইলে ; নহিলে : নইলে। অব্য

নাহি—নহে কি : নাকি। অব্য.

নিকা—বিধবা বিবাহ অথবা তালাক দেওয়া স্ত্রীলোকের সাথে বিবাহ। [আ. নিকাহ—বিবাহ] বি.

নিডুর—নিষ্ঠুর, নির্দয়। বিণ.

নিত্যিনিত্যি—নিত্য, রোজ রোজ। ক্রি.-বিণ.

নিষুধ—নিষেধ, বারণ, মানা। বি.

নোয়াব—নবাব, শাসনকর্তা। বি.

পইপই—পুনঃপুনঃ, বারবার। অব্য.

পইখ-পাখলা—পক্ষী ও পক্ষযুক্ত জীব। পাখলা পাখওয়ালা। বি.

পয়দা—জন্ম, উৎপত্তি। বি. [ফা.]

পরচাত্তে—পশ্চাতে, শেষে। ক্রি.-বিণ.

পরধাইন্যা—প্রধান, মোড়ল। বি.

পরধান—প্রধান, মোড়ল। বি.

পরস্তাব—প্রস্তাব। বি.

পরহেজগার—ধর্মপরায়ণ। বিণ.

পরান—প্রাণ, জীবন। বি.

পরিবার—স্ত্রী। বি

পাও—পা। বি.

পাডি—পাটি, মোত্রা নামক জলজ গাছের ছাল থেকে তৈরী মসৃণ মাদুর বিশেষ। [সং. পট্টি]। বি.

পাডের জাগ—পাটের জাগ ; পচিয়ে কোষ্টা আলগা করার জন্যে পানিতে ডোবান পাটগাছের স্তূপ। বি.

পাড়ি দিছে—পাড়ি দিয়াছে : পাড়ি দিয়েছে। মৃত্যুর পথে যাত্রা করেছে। ক্রি.

পাতি হিয়াল—পাতি শিয়াল। বি.

পানাডা—পানটা। বি.

পাল বরান্দে—পশুর (গরু-মহিষ-ভেড়ার) দলের মত।

পিচাশ—পিশাচ, মাংসাশী ভূত বিশেষ। বি.

পিডাইব—পিটুনি দেবে ; প্রহার করবে। ক্রি.

পিন্দমু—পরিধান করব, পরব। [প্রা.] ক্রি.

পিয়ারা—প্রিয়, প্রিয়পাত্র। বিণ. [হি.]

পুঁডি—পুঁটি, ছোট মাছ বিশেষ। বি.

পুত—পুত্র, ছেলে। বি. [সং. পুত্র]

পুষ্পক রথ—কুবের, রাবন প্রভৃতি পুরানে উল্লিখিত ব্যক্তিদের আকাশগামী রথ বিশেষ। বি.

পেডে—পেটে, উদরে, পাকস্থলীতে। বি.

পৈষ্য—পোষ্য, প্রতিপাল্য, যাদের পালন করতে হয়। বি.

পোঝা—বোঝা। বি.

পোনা মাছের বাচ্চা ; মাছের চারা একটা পোনাও যাবে না—(মাছের বাচ্চার মত ছোট) একটা প্রাণীও যাবে না। বি.

পোলা—পুত্র, ছেলে। বি.

প্যাদা—পিয়াদা : পেয়াদা। [ফা পিয়াদাহ]বি.

ফাউৎ—মৃত্যু, ধ্বংস [আ. ফৌত] অন্তঃসারহীন। বিণ.

ফতে—বি. বিজয় ; বিণ. সিদ্ধ, হাসিল বিজিত। [আ. ফতহ্]
ফাঁকিজুঁকি—নানা রকম প্রবঞ্চনা, ফাঁকি-ফুঁকি। [সং. ফক্কিকা] বি.
ফাঁটকি ফাঁকি, ধাপ্পা। বি.
ফাটক—ফটক, গেট, কারাগার, কারাদণ্ড, কারাবাস। বি. [হি. ফাটক—তোরণ]
ফাডাইয়া—ফাটাইয়া, বিদীর্ণ করিয়া : ফাটিয়ে। ক্রি.
ফাত্তা—ফাতেহা, শ্রাদ্ধ। বি. [আ. ফাতেহা]
ফান্দের কথা—ফাঁদের কথা।
ফালাইমু—ফেলিব, ফেলিয়া দিব : ফেলব, ফেলে দেব। ক্রি.
ফালাবি—ফেলবি। ক্রি.
ফুক্কা—ফাঁকা, শূন্য, যাদুকরের ফুৎকারে হঠাৎ শূন্য হওয়া। বিণ.
ফুডাইমু—ফুটাইব : ফোটাব। ক্রি. যেমন—ডিম থেকে বাচ্চা ফোটাব ; ফুল ফোটাবো।
ফুপু পিসি, বাপের বোন। বি. [হি. ফুফু]
ফেরববাজ—প্রবঞ্চক, দাগাবাজ। বিণ. [ফা. ফরেব—ধোকা, প্রবঞ্চনা]
ব'—বসিয়া পড় : বসে পড়। ক্রি. উপবেশন কর।
বইনগারে—বোনটিকে, ভগ্নীটিকে। বি.
বউগ—বধূদিগের, বধূদের : বউদের [সং. বউ, প্রা. বহু]
বক্তিমা—বক্তৃতা, ভাষণ। বি.
বচ্ছর—বৎসর : বছর। বি.
বডি—বঁটি, বটি, মাছ তরকারী ইত্যাদি কাটিবার/কুটিবার অস্ত্র। বি.
বড়া বাঁশ—মোটা মজবুত ও ঘন গিঁঠযুক্ত এক শ্রেণীর বাঁশ।
বয়লা—হাতের অলঙ্কার বিশেষ ; বালা। বি. [সং. বলয়]
বর্তন—থালা, বাসন। বি.
বরবাদ—সম্পূর্ণ নষ্ট। বিণ. [ফা.]
বরাদ্দ—নির্দিষ্ট, নির্ধারিত, নির্ধারিত পরিমাণ ব্যবস্থা। বিণ. [ফা. বরাওর্দ]
বলদ—হাল টানা বা গাড়ী টানা বা ভারবাহী গরু ; নির্বোধ। বি. [সং. বলীবর্দ]
বষ্যাকাল—বর্ষাকাল, বর্ষাঋতু, বৃষ্টিপাতের কাল, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস। বি.
বাঁইচ্চা—বাঁচিয়া : বেঁচে। ক্রি.
বাইট্যা—বাটিয়া : বেটে, পেষণ করে। ক্রি.
বাইল্যা—বেলে, বালুকাপূর্ণ। বিণ. বাইল্যা মাডি—বেলে মাটি।
বা'জান—বাবাজান, শ্রদ্ধেয় পিতা। বি.
বান্দে-ছান্দে—বাঁধুনী ও গঠনে।
বালি—নাকের গয়না বিশেষ। বি.
বিচরান—খোঁজা। ক্রি. [সং. বিচয়ন—অন্বেষণ]
বিচ্ছু কাঁকড়া বিছা, বৃশ্চিক। বি.
বিড়া—পানের গোছ বা বাণ্ডিল [সং. বীটিকা] বি.
বিদ্যাশে—বিদেশে।
বিয়াইন—বেহাইন, বেয়াইন : বেয়ান বি. ছেলে বা মেয়ের শাশুড়ী।
বিরণ—ভাজা। আণ্ডা বিরণ—ডিম ভাজা, ডিমের বড়া। বি.
বিরিক্ষি—বৃক্ষ, গাছ। বি.
বিলকি ছিলকি—প্রলাপ, অসংবদ্ধ কথা ; রোগের উপসর্গ বিশেষ। বি.
বিলাই—বিড়াল। বি. হি. বিল্লি. [সং. বিরাল]

বিস্তে—বেহেশ্‌তে, স্বর্গে। বি. [ফা. বিহিশ্‌ত]

বিহান বেলা—ভোর বেলা, প্রভাত [সং. বিভাত]

বুইজ্যা—বুজিয়া : বুজে, বন্ধ করে। ক্রি. চউখ বুইজ্যা—চোখ বুজে।

বুইড়া—বুড়া, বৃদ্ধ : বুড়ো। বিণ.

বুইল্যা—বলিয়া : বলে। ক্রি.-অব্য. জন্য, কারণে যেমন—তাই বুইল্যা—তাই বলে।

বু'জান—শ্রদ্ধেয়া ভগ্নী। বি.

বুঝলানি ?—বুঝিলে নাকি ? বুঝলে : নাকি ? ক্রি.

বুঝিন—বুঝি, বোধহয়। অব্য. [কাব্যে বুঝিনু]

বেইচ্যা—বেচিয়া : বেচে; বিক্রি করে। ক্রি.

বেইল—বেলা, সূর্য। বি.—বেইল ঘরে যায়—সূর্য ঘরে যায় অর্থাৎ সূর্য অস্ত যায়।

বেইশ—বেশ [অনুমোদন সূচক]। অব্য.

বেগর—বিনা, ব্যতীত। অব্য. [আ. বগয়র]

বেজার—অসন্তুষ্ট, বিরক্ত। বিণ. [ফা. বেয়ার]

বেতাল—তাল বা মাত্রাবোধের অভাব। বিণ.

বেবাক—সমস্ত, সমুদয়। বিণ. [ফা. বে+আ. বাকী]

বেবাকের—সকলের।

বেয়াক্কেইল্যা—আক্কেল বিহীন, বুদ্ধিবিহীন। বিণ. [ফা. আক্‌ল্—বুদ্ধি]

বৈডক—বৈঠক, সভা, অধিবেশন। বি. [হি. বৈঠক]

বৈতাল—তাল বা মাত্রাহীন। বিণ. বৈতাল মাগী—তাল বা মাত্রাহীন স্ত্রীলোক [গালি]

ব্যাঁক থাড়ু—বাঁকা খাড়ু; পায়ের অলঙ্কার বিশেষ।

ব্যাঁকাত্যাড়া—বক্র ও তির্যক; বাঁকা-তেড়া; সিধে ও সোজার বিপরীত। বিণ.

ব্যাডা—বেটা, পুত্র, পুরুষ, পরিচয়হীন অবজ্ঞেয় ব্যক্তি। বি. [সং. বটু]

ব্যালাক—ব্ল্যাক, কালোবাজার [ইং. ব্ল্যাক মার্কেট]

ব্যাবাকহানি—বেবাকখানি, সবটা, সম্পূর্ণটা। বিণ.

ব্যাহাতি—বেসাতি, পণ্যদ্রব্য, সওদা, ক্রীত দ্রব্যসম্ভার। বি. [আ. বিসাত]

ভইর্যা—ভরিয়া : ভরে। ক্রি. পূর্ণ করে।

ভর্দ—ভদ্র, শিষ্ট, সভ্য, মার্জিত, বিণ.

ভস্‌সা—ভরসা, আশা, আশ্রয়, নির্ভর, অবলম্বন। [হি. ভরোসা]

ভাইগ্যমান—ভাগ্যবান, সৌভাগ্যশালী। বিণ.

ভাইঙ্গা—ভাঙ্গিয়া : ভেঙে ক্রি.

ভাওবরাদ্দ—ভাব বরাদ্দ, ভাব গতিক, অবস্থা, ব্যবস্থা। বি. [সং. ভাব, হি. ভাও]

ভাঙমু—ভাঙ্গিব : ভাঙ্গব। ক্রি.

ভাজ—ভাইয়ের স্ত্রী, ভাবী। বি. [সং. ভ্রাতৃজায়া]

ভাদ্দর—ভাদ্র, বাংলা বছরের পঞ্চম মাস। [ব্রজবুলি ও কাব্যে ভাদর]

ভারানে—তন্ত্রমন্ত্র পড়ে ভূতের ভার আনার ধ্যানে।

ভালা—ভাল, ভালো। বিণ.

ভুরু—ভ্রূ, চোখের ওপরের পাতার ঊর্ধ্বে অবস্থিত রোমরাজি। বি.

ভেদের ব্যারাম—যে রোগে ভেদ বমি অর্থাৎ দাস্ত ও বমি হয় ; ওলাউঠা, কলেরা।
ভেন্টাইবার—ধ্বংস করবার। ক্রি. ভেন্টাইবার পারি—ধ্বংস করতে পারি।
ভ্যাদা—ভেদা, মৎস্যবিশেষ, কোন কোন অঞ্চলে মেনি মাছ বলে। বি.
মইধ্যে—মধ্যে, ভিতরে। ক্রি.-বিণ.
মইর‍্যা—মরিয়া : মরে। ক্রি.
মউয়ত—মৃত্যু। বি. [আ. মওত]
মতন—মত, মতো। অব্য.
মানাচ্ছি মতন—মনের ইচ্ছা মতো।
মন্তর—মন্ত্র। [কথ্য ও কাব্যে]
মন লয়—মন চায়, ইচ্ছা হয়।
মরদগুণে—পুরুষোচিতগুণে ভূষিত স্বামী। বি. [ফা. মরদ—পুরুষ]
মরাই—ধানের গোলা। বি. [সং. মরার]
মশকিল—মুশ্‌কিল, বিপদ, সংকট, ফ্যাসাদ। বি. [আ. মুশকিল]
মাইগ্যা—মাগিয়া : মেগে, ভিক্ষা করে, প্রার্থনা করে। ক্রি.
মাইনৃষের আলয়—মানুষের আলয়, মানুষের বসতি, মানুষের ঘর-বাড়ি। বি.
মাইয়াডা—মেয়েটা। বি.
মাডি—মাটি। বি.
মাতা মাথা, শির, মস্তক। বি.
মাথলা—মাথাল, পাতা ও বাঁশের চটা দিয়ে তৈরী মাথার আবরণ বিশেষ। বি.
মানতি—মানত (মনঃস্থ) কোন বিষয়ে অনুগ্রহ লাভের জন্য পীর বা দেবতার স্থানে কিছু দিবার মানসিক অংগীকার
মানু—মানুষ, লোক, ব্যক্তি। বি.
মিয়াভাই—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, বড় ভাই ; বাবা, চাচার বয়সী নয় অথচ বয়সে বড় বা সমবয়সী। অর্ধ পরিচিত বা অপরিচিত কাউকে সম্বোধন করার জন্যেও ব্যবহৃত হয়। যেমন—কোথায় যাইবেন মিয়াভাই ?' [ফা. মিয়াঁ—মনিব]।
মিডা—মিঠা: মিঠে। মিষ্টি, মধুর। বিণ.
মিডাই—মিঠাই, গুড়, মিষ্টি দ্রব্য। বি.
মিডাম—অল্প মিষ্ট স্বাদযুক্ত। বিণ.
মিশ্যা—মিশিয়া : মিশে। ক্রি.
মিসকিন—গরীব, ভিখারী। [আ. মিসকিন]
মিসমার—চূর্ণ-বিচূর্ণ, বিধ্বস্ত [আ.]
মিষ্টু—মিষ্ট : মিষ্টি। বিণ. [আদর সূচক উ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে মিষ্টু হয়েছে]
মিহিন—মিহি, সরু, সূক্ষ্ম। বিণ. [ফা. মহীন]
মুড়কি—গুড় বা চিনির রসে জারিত খই। বি.
মুলাম—মোলায়েম, নরম, মসৃণ ও কোমল। বিণ. [আ. মুলাইম]
মুহূর্তেক—মুহূর্তেক ; এক মুহূর্ত ; অল্পক্ষণ।
মেইল্যা—মেলিয়া : মেলে। ছড়িয়ে, খুলে। ক্রি.
মেকুর—বিড়াল। বি.
মোখ—মুখ। বি.
যন্তনা—যন্ত্রণা, কষ্ট, ব্যথা। বি.
যবর—কঠিন প্রকাণ্ড। বিণ. [আ যবর]
যহন - যখন, যে সময়ে, যে কালে। অব্য. [সং. যৎক্ষণে]
যাইমু—যাইব : যাব। ক্রি.
যাওন—যাওয়া, গমন। বি.
যাওনের—যাওয়ার।

র—যুতের, জুতের, সুবিধের,

মনোমত অবস্থার বা ব্যবস্থার। বি.
যুতি—তীরের মত বহু ফলা বিশিষ্ট অস্ত্র যা বিঁধিয়ে মাছ মারা হয়। বি.
যুদ্ধু—যুদ্ধ, লড়াই। বি.
যেইডা—যেটা। সর্ব
র'মানবে না—রও অর্থাৎ সবুর কর—এ উপদেশ মানবে না; অপেক্ষা করার নির্দেশ পালন করবে না।
রউদ—রৌদ্র : রোদ। সূর্যের কিরণ। বি.
রহম—রকম।
রহম—রহমত, রহম, করুণা, দয়া, কৃপা। বি [আ. রহমৎ]
রাইখ্যা—রাখিয়া : রেখে। ক্রি
রাইত—রাত্রি : রাত। রজনী, নিশা। বি.
রাখমু—রাখিব : রাখব। ক্রি
রাহুম—রাখিব : রাখব। ক্রি.
লগি—নৌকা ঠেলে চালাবার বাঁশ ইত্যাদির সরু লম্বা দণ্ড। বি.
লগে—সংগে, সাথে।
লবেজান—ওষ্ঠাগত প্রাণ, মরমর। বিণ. [ফা. লব-ই-জান]
লম্ফা—লম্বা, দীর্ঘ। বিণ. [সং. লম্ব]
লহু—রক্ত, শোণিত। বি. [সং. লোহিত]
লাইগ্যা—লাগিয়া। [কাব্যে], জন্যে। অব্য.
লায়েক—যোগ্য, সমর্থ, উপযুক্ত সাবালক। বিণ. [আ. নায়ক]
লুইট্যা-লাপইট্যা—লুটপাট করিয়া : লুটেপুটে।
লেইগ্যা—লাগিয়া [কাব্যে], জন্যে। অব্য.
লেজুড়—লেজ। বি.
লেল গাড়ি—রেলগাড়ী। বি.
লেহা—লেখা। বি.
লোয়া—লোহা। বি.
শইল মাছ—শোল মাছ। বি.
শরা-শরিয়ত—মুসলিম বিধি-বিধান; ইসলাম-নির্দেশিত ধর্মীয় আচার-আচরণ। বি.
শরীল—শরীর, দেহ। বি.
শাওন—শ্রাবণ, বাংলা সনের চতুর্থ মাস। বি.
শামুকখাজা—শামুকখোল, শামখোল, শামুক খাওয়া পাখী। বি.
শিন্নি—শিরণি, শিন্নি, চাল চিনি দুধ ইত্যাদি মিশিয়ে তৈরী খাদ্য-বিশেষ যা মানত করে পীরের স্থানে বা স্মরণে অথবা মসজিদে বিতরণ করা হয়। বি.
শুকুর—শোকর, ধন্যবাদ। [আ. শুক্‌র্]
শেরাদ্দ—শ্রাদ্ধ, মৃতের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা-পূর্বক অন্নাদি দান। বি.
সইজ্য—সহ্য। বি.
সতাই মা—সৎ মা; মায়ের সতীন। বি.
সদকা—উৎসর্গ। বি.
সর্মান—সম্মান, মর্যাদা, গৌরব। বি.
সাইজ্যা—সাজাইয়া, সাজিয়ে। ক্রি.
সাঁজুয়া তারা—সাঁঝের তারা, সন্ধ্যা-তারা। বি.
সাঙ্গা—বিধবার বিবাহ। বি.
সাবাস—সাহস
সিদা—সিধা : সিধে। সোজা, বাঁকা নয়। বিণ. [হি. সীধা]
সিয়ানা—সেয়ানা, চালাক, চতুর, প্রাপ্ত বয়স্ক [সং. সজ্ঞান]
সুম—সময়, কাল। বি.
সূর্য, রবি, দিবাকর। বি.

সোত—স্রোত, জলপ্রবাহ। বি.
সোন্দর—সুন্দর। বিণ.
সোয়াদ—স্বাদ। বি.
সোয়ামী—স্বামী। বি.
হউর-হাউরী—শ্বশুর শাশুড়ী। বি.
হগল—সকল, সমুদয়, সমস্ত। বিণ
হপন—স্বপন [কাব্যে.] স্বপ্ন। বি.
হবায়—সবেমাত্র, কেবলমাত্র
হবিরে—তাড়াতাড়ি। ক্রি.-বি.
হমান—সমান, তুল্য, অনুরূপ। বিণ.
হরিলুট—প্রসাদী বাতাসা ভক্তদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। বি.
হলদি—হলুদ। বি. [প্রা. হলিদ্দা; সং. হরিদ্রা]
হস্তা—সস্তা, সুলভ, কম দামী। বি. [ফা. সস্ত]
হাঁচা—সাচ্চা, সত্য। বিণ. [হি. সচ্চা, সং সত্য]
হাজাইয়া—সাজাইয়া : সাজিয়ে। পোশাক পরিচ্ছদ পরিয়ে। ক্রি.
হাত-হপনেও—সাত-স্বপ্নেও।
হানি—খানি। বেবাকহানি—সবখানি।
হাপ—সাপ, সর্প। [সং. সর্প]
হাপন—আপন, নিজ, স্বীয়। বিণ. [সং. আত্মন]
হাবাইত্যা—হাভাতে, ভাতের জন্য হায় হায় করে এমন। বিণ.
হামি—আমি। সর্ব.
হাম্বা—মরা বাছুরের চামড়ার ভিতর খড়কুটো ভরে তৈরী নকল বাছুর। বি.
হায়ান—পশু। বি. [আ. হায়ওয়ান]
হাশর—শেষ বিচারের দিন।
হিগ—শিখেনে।
হিগাইতে—শিখাইতে : শেখাতে। ক্রি.
হুইতে—শুইতে, শয়ন করিতে : শুতে। ক্রি.
হুইন্যা—শুনিয়া : শুনে। ক্রি.
হুইলে—শুইলে, শয়ন করিলে : শুয়ে পড়লে। ক্রি.
হুকনা—শুকনা : শুকনো বিণ.
হুকাইয়া—শুকাইয়া : শুকিয়ে। ক্রি.
হুড়ুম—মুড়ি। বি. [সং. হুড়ুম্ব]
হুনছি—শুনিয়াছি : শুনেছি। ক্রি.
হে অইলে—তাহা হইলে : তা হলে।
হেইয়া—তাহা : তা
হেতে—তাহাতে : তাতে।
হে দিনের—সেই দিনের : সেদিনের।
হেফাজত—নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ। বি. আ. হিফায‌্ত।
হোন শ্রবণ কর, শোন। ক্রি.
হোনলাম শুনিলাম, শ্রবণ করিলাম : শুনলাম ক্রি.
হোয়—শোয়, শয়ন করে। ক্রি.